মুসলিম নির্যাতন
দেশে দেশে

ইকবাল কবীর মোহন

মুসলিম নির্যাতন
দেশে দেশে

ইকবাল কবীর মোহন

মুসলিম নির্যাতন দেশে দেশে

ইকবাল কবীর মোহন

প্রকাশনায় ঃ
দীপ্তি প্রকাশন
৩১৭/২, পশ্চিম রামপুরা
ঢাকা।

প্রকাশকালঃ
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

মুদ্রকঃ
আল আকাবা প্রিন্টিং প্রেস
৪৯৪, বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৪০ ৬৬ ৩৮

মূল্য ঃ ষোল টাকা মাত্র

MUSLIM NIRZATAN, DESHE DESHE, BY IQBAL KABIR MOHON
PUBLISHED BY DIPTI PROKASION PRICE : Taka Sixteen only.

ভূমিকা

প্রভাতের সোনালী সূর্য কিরণ যেভাবে চারিদিক আলোকিত করে দেয়, ঠিক তেমনি হেরার গুহা হতে বিচ্ছুরিত ইসলামের কিরণরাজি একদিন সারা দুনিয়াকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল। পৃথিবীর জানা–অজানা জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল তওহীদের অমিয়বাণী। উত্তর হতে দক্ষিণ,পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে দ্রুত সম্প্রসারিত হয় কালজয়ী আদর্শ ইসলাম। ঈমানের দৃপ্ত শপথে জেগে উঠেছিল সারা জাহানের দিশেহারা মানুষগুলো। ফলে সর্বত্র গড়ে উঠে এক আলাদা ঐতিহ্য এবং অতুলনীয় এক সভ্যতার। কিন্তু কালের চক্রে মানুষ হয়ে পড়ে আবার বিভ্রান্ত। মানুষের তৈরী উদ্ভট কল্পনা বিলাসে মানবতা মুক্তির দিশা খুজে পাবার চেষ্টা চালায়। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের সস্তা শ্লোগানে মানুষ মেতে উঠে। শুরু হয় নতুন নতুন মতবাদের নবযাত্রা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম হয়ে পড়ে কোণঠাসা। শুধু তাই নয়, নতুন মতবাদগুলোর প্রতি জড়িয়ে পড়া মানুষ ইসলামী মূল্যবোধকে দূরে ঠেলে দেয়ার জন্যও চেষ্টা করতে থাকে। এ প্রচেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়।

সমাজতন্ত্রের উত্থান শুরু হয় উনবিংশ শতকের গোড়া হতে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব এতে এনে দেয় এক নবতর চেতনার। ক্রমে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের ধ্বজাধারীরা হয়ে উঠে উগ্র। শক্তির মহড়া নিয়ে এরা অগ্রসর হতে থাকে সামনে। জবর দখল চলে দেশে দেশে। গায়ের জোরে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াসে অতি দ্রুত বেশ ক'টি দেশে কায়েম হয় সমাজতান্ত্রিক সরকার। এশিয়া, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের ডজন খানেক দেশে আজ সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মুক্তি,বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নামে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দিলেও মুক্তি সেখানে আসেনি। বরং অর্থনৈতিক দৈন্যের অক্টোপাশে বন্দী হয়েছে কম্যুনিষ্ট বিশ্ব । তাই তো এখন সমাজতন্ত্রের পোষ্টমর্টেম করা হচ্ছে দেশে দেশে। সংস্কারের নামে কমিউনিজম হতে ধীরে ধীরে সরে আসছে বিভ্রান্ত মানুষ।

সমাজ বিপ্লবের নামে এতদিন কমিউনিষ্টরা আর যাই করুক না কেন সে সব দেশের মুসলমানদের উপর চালিয়েছে সফল নির্যাতন এবং নিপীড়ন। কমিউনিজমের মন্ত্রে দীক্ষিত সরকারী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারে বিভিন্ন দেশে যে হত্যা, গুম, জেল এবং নির্বাসন চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ১৯১৭ সাল হতে শুরু করে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত নির্যাতন থামেনি এদের। তবে এই অমানবিক অত্যাচারের অনেক খবরই জানে না মুক্ত বিশ্বের বিবেকবান মানুষ। কারণ সমাজতন্ত্রের দুর্ভেদ্য বন্দীশালার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কোন তথ্য বেরিয়ে আসাটা যেমনি কঠিন, তেমনি অভাবনীয়। তারপরও মাঝে–মধ্যে যে দু'চারটা ছিটেফোটা খবর নিকষ আঁধারের পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসে তা যে কত মর্মান্তিক, পাঠক মাত্রেই তাতে চমকে উঠার মত।

কমুনিষ্ট দুনিয়া ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শাসিত পশ্চিমা বিশ্বেও মুসলমানদের জীবনযাত্রা খুব একটা কুসুমাস্তীর্ন নয়। সেখানকার মুসলমানও ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। দুনিয়া জোড়া মুসলমানদের বর্তমানে যে করুন অবস্থা তার চিত্রই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে ''মুসলিম নির্যাতন দেশে দেশে'' বইটিতে। ইসলামী সমাজ নির্মানের নিয়ত চেষ্টায় ব্যস্তকর্মীদের প্রেরণা সৃষ্টি এবং দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমানদের প্রতি বিশ্ব মুসলিমের দায়িত্ব বোধকে এই বইটি জাগ্রত করবে বলে আমার বিশ্বাস

এই পুস্তক রচনায় বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকাটা স্বাভাবিক। পাঠক সমাজ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে এসব দুর্বলতাগুলো দেখলে কৃতার্থ হবো।

ইকবাল কবীর মোহন

সূচীপত্র ঃ

○ রাশিয়ার বন্দী মুসলিম ৫
○ বুলগেরিয়ায় ইসলাম ১১
○ যুগোশ্লাভিয়ার বিপন্ন মুসলিম ১৯
○ রুমানিয়ার মুসলমান ২৮
○ কমিউনিষ্ট যাতাকলে ইথিওপিয় মুসলিম ৩৩
○ দক্ষিন ইয়েমেনে মুসলিম নির্যাতন ৩৮
○ হাঙ্গেরীতে ইসলাম ৪২
○ চীনে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ৪৭
○ আলজেরিয়ার বিপন্ন মুসলমান ৫২
○ আলবেনিয়ার মুসলমান ৫৫
○ বার্মার অসহায় মুসলিম ৬২
○ পোল্যাণ্ডের মুসলিম জীবন ৬৬

রাশিয়ার বন্দী মুসলিম

ইউরোপ ও এশিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে বৃহত্তম দেশ রাশিয়া দুনিয়ার প্রথম এবং বর্তমানে প্রধান সামজতন্ত্রী দেশ। সত্তর মিলিয়ন লোকের এই দেশ। এখানেও রয়েছে মুসলিম জাতির বসবাস। মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকা জুড়ে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছিল ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগ থেকেই। খলীফা উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলে (৬৪৪-৬৫৬) মুসলমানেরা মধ্য এশিয়ায় এসে পৌছে। বসরার শাসনকর্তা ইবনে আমীর আমু দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গ মালা অতিক্রম করে বলখ, তুখারিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে। খলিফা মাবিয়ার আমলে ইরান ও খোরাসানের শাসনকর্তা জিয়াদের পুত্র বোখারা দখল করেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর এক পুত্র সমরখন্দ ও তিরমিজ দখল করেন ৬৭৪ খৃষ্টাব্দে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের আঠারটি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কাজাকাস্তান, কিরমিজিয়া, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান এবং আজারবাইজান- এই ছয়টি প্রজাতন্ত্রে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়। উমাইয়া যুগে মধ্য এশিয়া বিজিত হলেও তথাকার দখল ততটা দৃঢ় ছিল না।

আব্বাসীয় যুগে (৭৫০-১২৫৮) এই অঞ্চলে অনেকগুলো স্থানীয় শাসক বংশের অভ্যুদয় ঘটে। এদের মধ্যে ছিলো খোরাসানের তাহেরী বংশ (৮২০-৮৭২), সিজিস্থানের সাফফারী বংশ (৮৬৭-৯০৮), মধ্যে এশিয়া ও পারস্যের সামানী বংশ (৮৭৪-৯৯৯)। এদের রাজধানী ছিল বোখারা। তা ছাড়াও গজনী বংশ (৯৬২-১১৮৬), বুরাইদ বংশ (৯৪৫-১০৫৫) এবং সেলজুক তুর্কীদের বংশ (১০৫৫-১১৯৪) এতদ অঞ্চলের শাসনকার্য চালায়। এসব বংশের শাসন পরিচালনার সময়েই মধ্য এশিয়ার ইসলাম প্রচার এবং প্রসারের ব্যাপ্তি ঘটে। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতকে মধ্য এশিয়ায় শুরু হয় মোংগল বর্বরতা। মোঙ্গল শাসনের পর মধ্য এশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে এখানকার মুসলিম শক্তি এবং প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে যায়। যার ফলে পরবর্তীকালে রুশ বিজয় ত্বরান্বিত হয়।

ষোড়শ শতকের দিকে রাশিয়ার দৃষ্টি পড়ে মধ্য এশিয়ার দিকে। ইউরোপে ফরাসী, জার্মানী এবং ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রাশিয়া মধ্য এশিয়ায় তার প্রভাব বিস্তারে মনোনিবেশ করে। ১৮৮৪ সালের মধ্যেই এখানকার বেশ ক'টি অঞ্চল দখল করে নেয় রাশিয়া। রাশিয়ায় কমুনিষ্ট বিপ্লবের

পর প্রথমে ফারিজম এবং উজবেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হয়। পরে এর নাম দেয়া হয় উজবেকিস্তান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৫ সালে তুর্কেমেনিস্তান, ১৯২৯ সালে কিরমিজিয়া, ১৯৩৬ সালে তাজাকিস্তান প্রজাতন্ত্রগুলো স্থাপন করা হয়।

১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব সাধিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত প্রজাতন্ত্রগুলোতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত ছিল। যদিও রাশিয়ার জার সরকার মুসলমানদের উপর প্রচন্ড দমননীতি চালাতে ভুল করেনি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় লেনিন মুসলমানদের তার সমর্থনে রাখার জন্য আপ্রাণ প্রছেষ্টা চালায়। এজন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মুসলিম নির্যাতনের জন্য সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেনি লেনিন। মুসলিমরা এজন্য লেনিনকে সমর্থন না করেও পারেনি সঙ্গত কারণেই।

বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হলো। বিপ্লবের নায়ক লেনিন হলেন রাষ্ট্রের প্রধান– একনায়ক সরকার। এক্ষণে লেনিনের মুসলিম প্রীতি এবং সমাজতন্ত্রের ধোকাবাজি চরিত্র ফুটে উঠলো। মুসলমানদের জবাই করার পরিকল্পনা নেয়া হলো রাষ্ট্রের পক্ষ হতে। ১৯২০ সাল হতে ১৯৩০ সালের মধ্যে রুশ নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদও লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠাব্রতে অবতীর্ন হবার জন্য ইসলাম উৎখাতের কাজ শুরু করলেন। ১৯২০ সালের সূচনাতেই এই হত্যাযজ্ঞের মহৎ কাজটি আরম্ভ হয়। মুসলিম এলাকাগুলোর প্রতিভাধর মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরী করে তাদের হত্যা করা হয়। লাখ লাখ মুসলমানকে জবাই করা হলো সমাজতন্ত্রের স্বার্থে।

বিপ্লবের পূর্বে একদল বিভ্রান্ত মুসলমান যারা লেনিনকে মুসলিম এলাকাগুলোর স্বাধীনতা ফিরে পাবার শর্তে সমর্থন করেছিল তারাও রেহাই পেল না হত্যাযজ্ঞের হাত হতে। মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি রুশ নেতৃবৃন্দ। ইসলামের মত কালজয়ী আদর্শ যাতে প্রচারিত এবং প্রসারিত না হতে পারে তার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করলো রাশিয়া। মসজিদ ও মাদ্রাসার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রায় আট হাজার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হলো। কুরআনের আইন এবং মুসলিম রীতিনীতি স্থায়ীভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল। হাজার হাজার মসজিদ ধ্বংস করা হল। সারা দেশের ছাব্বিশ হাজার মসজিদের মধ্যে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ধ্বংসের হাত হতে রেহাই পেল মাত্র তেরশ সমজিদ। এদের অনেকগুলোই ব্যবহার হল ক্লাব এবং পার্টির অফিস হিসেবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়া জার্মানী দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই অবস্থায় মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য সরকার মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো আপাততঃ ধ্বংসের হাত হতে রেহাই দেন। দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে কয়েক লাখ মুসলিম সেনা জার্মানীর বিরুদ্ধে মরণপন লড়াই করে। অবশেষে রাশিয়া বিজয়ী হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে পুনরায় মুসলমানদের উপর শুরু হয় পৈশাচিক নির্যাতন। লৌহ মানব নিকিতা ক্রুচেভ মুসলমানদের হত্যাকার্য পুরোদমে চালালেন। এ সময় মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং নেতৃবৃন্দকে আরেক দফা হত্যা করা হলো ঠান্ডা মাথায়। ইসলামকে আরেক ধাপ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হলো। অবশিষ্ট তেরশ মসজিদকে কমিয়ে বারশতে নামিয়ে আনা হলো। রাশিয়ার মুসলমানরা এক বিরাট ধ্বংসের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শুরু হল এক নব জাগরণ। বিপুল তৈল সম্পদ এবং এর অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ফুলে ফেঁপে সমৃদ্ধ হল উপসাগরীয় এবং আরব অঞ্চলের মুসলিম জনপদ। মুসলমানদের হাতে অর্থের ভান্ডার এসে গেল। ধূর্ত রাশিয়ার বর্বর কম্যুনিষ্ট সরকার তার নীতিতে পরিবর্তন আনার কথা ভাবলো। মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো রাশিয়া। তাই আপাততঃ তার বীভৎস মূর্তিকে ঢেকে রাখার এক অপকৌশল আঁটলো সে। ক্রুচেভের পর রুশ সমাজতান্ত্রিক পার্টির হাল ধরলেন ব্রেজনেভ। মুসলমানদের বন্ধু সাজবার চেষ্টা চালালেন তিনি। তিনি ক্ষমতায় এসেই মুসলিম নিদর্শনগুলো ধ্বংস করার পরিকল্পনা স্থগিত রাখলেন। শুধু তাই নয়। মুসলমানদের জন্য একটা নিরাপদ অবস্থান গড়ে তোলার মাধ্যমে বাইরের লোকদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা ও আঁটলেন তিনি। মুসলিম দেশগুলোর অর্থের ভান্ডার কুক্ষিগত করার জন্য তিনি কিছু কিছু মুসলিম নিদর্শন মেরামত করালেন এবং কমুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত একটা পাতানো ইসলাম চালু করার ব্যবস্থা করলেন ব্রেজনেভ।

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার নাস্তিক সরকার তার দীর্ঘ শাসনামলে মুসলমানদের প্রকৃত পরিচয়টুকু মুছে ফেলার জন্য ও কম চেষ্টা করেনি।.এজন্য মুসলমানদের কৃত্রিম জাতিতে ভাগ করারও প্রচেস্টা চালানো হয়। বিভিন্ন মুসলিম গোত্রকে নতুন জাতি আখ্যা দিয়ে রাজনৈতিক বিভক্তি থেকে শুরু করে এসব তথাকথিত জাতির মধ্যে নতুন জাতির বর্ণমালা এবং সাহিত্যের ও প্রচলন করা হয়। মুসলমানদের উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন, কাজাক, কিরমিজ এবং অন্যান্য জাতীয় হিসেবে পরিচিত করা হয়। ফলে বিপ্লবের আগে এরা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করলেও এখন তারা নিজেদের কেউ উজবেক, কেউ তাজিক অথবা কেউ

তুর্কমেন মনে করে থাকে। ফলে নিজেদের মুসলিম ঐতিহ্য হতে রাশিয়ার মুসলমানরা সত্তর বছর পর বহুদূর সরে পড়েছে।

রাশিয়ার মুসলমানরা যাতে তাদের জাতীয় চরিত্র হারিয়ে কমুনিষ্ট চরিত্রের সাথে মিশে যেতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে রাশিয়ায়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নাস্তিকরা মুসলমানদের সাথে টার্গেট ভিত্তিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পিত উপায়ে কমুনিস্টরা মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করেও রাশিয়ার মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে এমনটি মনে হয় না। মধ্য এশিয়া, মধ্য ভোলগা এবং ককেশাসের মুসলমানরা নিজেদের মুসলিম চেতনাটুকু ভুলে যায়নি। তারা নিজেদের জীবনে একজন খাঁটি মুসলিমের বৈশিষ্ট্যগুলো ধরে রাখতে না পারলেও ইসলামের বেশ কিছু রীতিনীতি চালু আছে এদের মধ্যে। সেগুলো হলো ইসলামী রীতিতে বিয়েশাদী, খতনা করা এবং দাফন কাফনে ইসলামী নিয়ম নীতি মেনে চলা ইত্যাদি।

রাশিয়ার সরকার বাইরের দুনিয়াকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে সব কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন তাও বেশ চমকপ্রদ। সরকার ইসলামী কার্যক্রমগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চারটি ডাইরেকটরেট চালু রেখেছেন। বিদেশী পর্যটকদের দেখানোর জন্য এইসব ডাইরেকটরেট সরকারী কিছু নামাযীর ব্যবস্থা করে রাখে। তাশখন্দের মুফতি সরকারী ইসলামের একমাত্র মুখপাত্র। তিনি রাশিয়ার অনুকুলেতাদেরই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইসলামের প্রচারণা চালিয়ে থাকেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে তিনি রাশিয়ায় ইসলাম এক মহান ব্রত নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তা বুঝিয়ে দিতে ও কার্পণ্য করেন না। অথচ এরই অন্তরালে ইসলামী মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ 'বিনাশের কাজ চালিয়ে যায় রাশিয়া।

রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ইসলামকে সমূলে উৎখাত করার চেষ্টা চালালেও দীর্ঘ সত্তর বছরে তারা তেমন কিছু আশাতীত ফল লাভ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এর মধ্যেও তাজা দিল মুসলমানদের হৃদয় মুকুরে লালিত হয় ইসলামের বাণী। এসব সিংহদিল ঈমানদাররা রুশ কেজিবিকে ফাঁকি দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন ইসলামের অনুশীলন এবং প্রচার ও প্রসারের কার্যক্রম। রুশ সরকারের আইনে ধর্ম পালনের ব্যাপারে কঠোর বিধান থাকলেও এসব অকুতোভয় মুসলমানরা নামাযের জন্য মসজিদ এবং ইসলামী শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদ্রাসা তৈরী করে কাজ চালাচ্ছেন গোপনে গোপনে। মুসলিম সোভিয়েট এলাকায় এ ধরনের শতশত মসজিদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এমনকি কমিউনিজমের প্রাণকেন্দ্র কমিউন খামারের কাছেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মসজিদ।

তবে এসব দুঃসাহসিক তৎপরতা চালাতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে বহু মুসলমানকে। শ্রম শিবিরে জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত নিঃশেষ করে দিতে হয়েছে বহু তাজা দিল মুমিনকে। কেজিবি, মাড, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর চোখ এড়াতে না পেরে প্রতিনিয়ত বহু মুসলমান রুশ সরকারের কঠিন শাস্তি মেনে নিতেহচ্ছে।

রুশ মধ্য এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোতে অবশ্য এ ঝুঁকি খুব একটা বেশী নেই। এখানে রাশিয়ানদের সংখ্রা খুব কম। সম্প্রতি এসব এলাকার নেতৃ স্থানীয় পদে মুসলমানরা নিযুক্তি লাভ করছে। রাশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদও তারা দাবী করছে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞান একাডেমীতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যাচ্ছে। মুসলিম যুবকরা উচ্চতর প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করে চলছে।

এদিকে রাশিয়ার মুসলমানদের মগজ ধোলাই করার প্রক্রিয়াও চলছে অব্যাহত গতিতে। যাদের মগজ ধোলাই হয়েছে বলে মনে করা হয় তাদেরকে বর্তমান সেনাবাহিনীতেও যোগদানের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদের নিয়মিত ইউনিট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিটে ভর্তি করা হলেও উন্নত এবং অত্যাধুনিক ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের প্রশিক্ষণ তাদেরকে দেয়া হয় না। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রুশ দখলের সময়ই এই ব্যাপারটি প্রমাণিত হয়ে যায়। এসময় বহু মুসলমান সৈন্যকে পাঠানো হয় আফগানিস্তানে। তাদের ভাল ধরনের প্রশিক্ষণ না থাকায় যুদ্ধে তারা ভাল করতে পারেনি। বরং অসংখ্য মুসলমান সৈন্য মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়। এ সময়ে আরেকটি বিষয় খুবই লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়ে। সৈন্যরা কাবুলের বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে কোরআন শরীফ খোঁজ করে তা কেনার চেষ্টা চালায়। রাশিয়ায় কোরআন পাওয়াটা যেমন দুষ্কর তার দামও তেমনি আকাশচুম্বী। যুদ্ধের এই সময় রুশ বাহিনীর মুসলিম সৈন্যরা মুজাহিদ বাহিনীর সাথেও হাত মিলায় এবং মুজাহিদদের অস্ত্র শস্ত্র প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করে। এমন অবস্থায় রুশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিপাকে পড়ে যায়। ফলে ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যেই সেনাবাহিনীর মুসলিম সৈন্যদের আফগানিস্তান হতে দেশে ফিরিয়ে নেয়।

এদিকে আফগানিস্তানে রুশ জবর দখলের পর মুজাহিদদের প্রতিরোধ এবং রাশিয়ার বিপন্নকর অবস্থা পার্শ্ববর্তী রুশ অধ্যুষিত মুসলিম এলাকার মানুষের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তারা বিভিন্নভাবে আফগান মুসলমানদের সংগ্রাম বা জেহাদের বিষয়টি ঘনিষ্টভাবে জানার চেষ্টা চালায়। ফলে মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব চেতনার। যে সব রুশ মুসলিম সৈন্য দেশে ফিরে যায় তারা আফগান মুসলমানদের ঈমান এবং ইসলামী জোষ দেখে

অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তা নিজ নিজ জাতি বা গোষ্টির মধ্যে প্রচারিত হয়ে পড়ায় প্রচন্ড সাড়া জাগে সেখানে। এদিক ইরানের ইসলামী বিপ্লব দুনিয়া জোড়া যেঅভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও রুশ মুসলমানদের প্রভাবিত করে। তৃতীয়তঃ রাশিয়ায় যেসব মুসলমান ছাত্র লেখাপড়া করতে যাচ্ছে তারাও সেখানকার মানুষের মধ্যে বহির্বিশ্বের ইসলামী পূর্নজাগরণের চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশন করে তাদেরকে ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

রুশ বিপ্লব সাধনের পর হতে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং চিন্তাচেতনা ধ্বংস করার জন্য যাবতীয় চেষ্টা সাধনা হয়েছে রাশিয়ায়। নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্মূলের। কিন্তু বাস্তবে তা পুরোপুরি সফল হয়নি। এসব কার্যক্রম বরং মুসলিম জনগোষ্ঠিকে করেছে বিক্ষুব্ধ। তাদের মধ্যে দমননীতির প্রচেষ্টা বাইরের জগত সম্পর্কে তাদের আগ্রহকেই বাড়িয়েছে বহুগুনে। রুশ মুসলমানরা কেজিবি গোয়েন্দার জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু তাদের মনের গহীনে চাপা পাড়ে আছে এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরি। সময় ও সুযোগ পেলে যে কোন মুহূর্তে এর থেকে অগ্নি লাভার উৎগীরণ শুরু হতে পারে। ফলে একটা প্রচন্ড ধাক্কায় রুশ বর্বরতার প্রাসাদ ভেংগে খান খান হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাকে কোন ক্রমেই উড়িয়ে দেয়া যায় না। দুনিয়ার মুক্ত মানুষ অচিরেই এমন একটা সময় হয়তোবা অবলোকন করার সুযোগ পেয়েও যেতে পারে।

বুলগেরিয়ায় ইসলাম

বুলগেরিয়া সমাজতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্র দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত একটি দেশ। ইউরোপীয় ইতিহাসের ঝটিকাকেন্দ্র বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্গত এ দেশটি পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট ব্লকভূক্ত দেশ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আয়তন ১১০৯১১ বর্গকিলোমিটার (৪২৮২৩ বর্গমাইল)। লোক সংখ্যা প্রায় ১ কোটি। মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলিম। অবশিষ্টাংশ খৃষ্টান, ইহুদী ও নাস্তিক কমিউনিষ্ট। রাজধানী সোফিয়া। ভাষা বুলগেরিয়ান, তুর্কী, তাতরিী, স্লাভ।

জাতিসত্তার দিক থেকে জনগণ বুলগেরিয়ান, তুর্কী, আর্মেনিয়ান, জিপসী, পোমাক, গাগাউজ, তাতার, আলফাজির ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠিতে বিভক্ত। তুর্কী, তাতারী, জিপসী ও পোমাকদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

দু'টি পর্বতমালা এবং দু'টি উপত্যাকা বুলগেরিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলকান পর্বতদেশের প্রায় মাঝ বরাবর পূর্ব পশ্চিমে প্রসারিত রডপি (Rhodope) পর্বত পশ্চিম বলকান থেকে কিছু বাঁক নিয়ে দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর প্রায় সমান্তরাল রেখায় বিস্তৃত। বুলগেরিয়ার মারিতসা উপত্যকা দুই পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত। দক্ষিণ বলকান রেঞ্জ ও দানিয়ুব এর মধ্যবর্তী উত্তর সীমান্ত হচ্ছে মালভূমি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই মালভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বুলগেরিয়ার প্রধান প্রধান শহর হচ্ছে প্লভদিভ (বাণিজ্য কেন্দ্র), ভার্ণা (কৃষ্ণ সাগর বন্দর), রুসা (প্রধান দানিয়ুব বন্দর),বুমাক, ব্লারগো, ফেভারড, স্লিভেন, সামানওয়ারন, ফার্ণা, আদিনু, মরিঝিলইত্যাদি।

বুলগেরিয়ার পূর্বে অস্ট্রিয়া, তুরস্ক ও কৃষ্ণসাগর, উত্তরে রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী, পশ্চিমে যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস এবং দক্ষিণে গ্রীস ও এজিয়ান সাগর।

বুলগেরিয়ায় প্রায় ১৮ লাখ তুর্কী সংখ্যালঘু রয়েছে। এরা সবাই মুসলিম। এছাড়াও ৫ লক্ষ পোমাক ও ৪ লক্ষ জিপসী মুসলিম সংখ্যালঘু উত্তর, মধ্য বুলগেরিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এ সব সংখ্যালঘুদের মধ্যে ঐতিহ্যিক ও আদর্শিক চেতনা প্রকট। বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক এরা নির্যাতিতও হচ্ছে। বুলগেরিয়ায় বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকায়ন কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় শত শত গ্রামের আমূল সংস্কার করা হচ্ছে। বুলগেরীয়করণের নামে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। মুসলমানরা আজ বুলগেরিয়ায় স্বীয় ইতিহাস

ঐতিহ্য ও নাম পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতেও সক্ষম নয়। বুলগেরিয়ার এ আধুনিকায়ন ও বুলগেরীয়করণ কর্মসূচীর বিরুদ্ধে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। প্রধানত তুর্কী, পোমাক, তাতারী ও জিপসী বংশোদ্ভূত মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত শত শত গ্রামকে আধুনিকায়ন ও বুলগেরীয়করণের নামে ধ্বংসকরাই হচ্ছে এই সব নির্যাতনমূলক অথচ মুখরোচক কর্মসূচীর লক্ষ্য।

বুলগেরিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র রাজনৈতিক দল এবং এ দলই রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টই রাষ্ট্র প্রধান। ডিমিটার গ্রানেভের মৃত্যুর পর ১৯৬৬ সালে গেয়র্গি ত্রাইকভ প্রেসিডেন্ট হন, প্রধানমন্ত্রী হন টোডর ঝিভকভ। বর্তমানে টোডর ঝিভকভ বুলগেরিয়ার প্রেসিডেন্ট। এখানে সোভিয়েত ধাঁচের একদলীয় স্বৈরশাসন চালু রয়েছে। সোভিয়েত বলয়ভুক্ত ওয়ারশ জোটের সদস্য এই দেশটি কার্যত স্বাধীন আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সক্ষম নয়।

বুলগেরিয়ার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিভিত্তিক। প্রধান কৃষিপণ্য হচ্ছে গম, বার্লি, বার্ণ, সব রাই, তামাক, আলফা, তুলা, আলু ইত্যাদি। প্রধান শিল্প ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারিং যন্ত্র নির্মাণ, রকেট নির্মাণ, হাইড্রলিক, ভারী যানবাহন ও রাসায়নিক শিল্প। ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরিকল্পনা ভিত্তিক অগ্রগতি হলেও উৎপাদিত পণ্যের মান নিম্নমুখী। তবে বৈদ্যুতিক, আইসিই ট্রাক ও ইলেকট্রিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে বর্তমানে অগ্রগতি হয়েছে। প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তামাক, প্রক্রিয়াজাতকৃত ফল, মাছ, শাকসজী, বস্ত্র, পরিবহণ যান, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং ধাতব দ্রব্য। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে সফট কয়লা, ক্রোমাইট, জিপসাম, আকরিক লৌহ, রক সল্ট, ম্যাঙ্গানীজ ও রৌপ্য।

প্রাকৃতিক সম্পদে মোটামুটি সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিজমের ব্যর্থতা ও সোভিয়েত প্রভাব বলয়ে থাকার কারণে বুলগেরিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে দফায় দফায় অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। সোভিয়েতের বিশ্বস্ত মিত্রদেশ হওয়ার কারণে গরবাচভের পেরেসত্রোইকা কর্মসূচীর প্রভাবে বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট সরকার সম্প্রতি শিল্প কারখানার ম্যানেজারদের উৎপাদন কর্মকান্ডে আরো দায়দায়িত্ব দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে রাষ্ট্রীয় তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বুলগেরিয়ায় সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের মালিকানাভুক্ত । শিল্প কারখানা ব্যবস্থাপনার সমষ্টিগত বিকেন্দ্রীকরণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তথাকথিত মার্কসবাদী অর্থনৈতিক মতবাদ বাস্তবে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বুলগেরিয়ায় রাজনৈতিক ইতিহাস ও ইসলাম

বুলগেরিয়া আজ যে সব অঞ্চল নিয়ে গঠিত তা এক সময় রোমানদের উপনিবেশ ছিল। সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে ৬৭৯ সালে তুরান গোষ্ঠীভুক্ত বুলগার জাতির লোকেরা উত্তর দিক থেকে দানিয়ুব অতিক্রম করে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপস্থিত প্রাচীন রাজ্য মিশি, যা তখন রোমানদের একটি প্রদেশ ছিল, দখল করে স্থানীয় শ্লাভদের পরাভূত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে। এই বুলগার জাতিসত্তার শাসকগণ সমস্ত বলকান অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন এবং বুলগার অধিপতি সিমিওনের সময় বুলগারদের সাম্রাজ্য আড্রিয়াটিক সাগর হতে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বুলগার শাসকগণ বলকানের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হন।

বুলগেরিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটে আরব উপদ্বীপে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই। বুলগেরিয়ায় মুসলিম বিজয়াভিযান প্রেরিত হওয়ার বহু আগে থেকেই বুলগেরিয়ার জনগণ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা এ সত্যকে ঢাকতে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বলেছে বোধহয় জনগণকে মুসলিম হতে বাধ্য করা হয়েছিল। সম্প্রতি ডঃ মুহাম্মদ বিন নাসির আল আবুদী তাঁর এক গবেষণা প্রবন্ধে বুলগেরিয়ায় ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে বলেছেন, The Bulgarians who are ofTurkish origin came from the east and established a strong Muslim state in the Danube River basin in the year 779 A.D. এ অঞ্চলই বর্তমানে বুলগেরিয়া নামে পরিচিত। তুর্কী বংশোদ্ভূত সহজ সরল বুলগাররা সহজেই দ্বীন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় পূর্ণভাবে অধিষ্ঠিত হতে না পারলেও ইসলাম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শক্তিশালী ভিত অর্জন করে। ১০১৮–১১৮৬ বুলগেরিয়া বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। ১১৮৫–১২৭৯ বুলগেরিয়া স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে। ১৩৬৩ সালে বুলগেরিয়ায় তুর্কীদের বিজয়াভিযান প্রেরিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বলকান অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ ও অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে এশিয়া মাইনরের প্রবল উসমানীয় তুর্কী মুসলিম বাহিনী চর্তুদশ শতাব্দী হতে ঢেউয়ের মত বলকার জাতিগুলোর উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উডডীন করে। উসমানী সুলতান প্রথম মুরাদ (১৩৫৯–৮৯) ১৩৬০ সালে আড্রিয়ানোপল দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করলে তুর্কীদেরকে ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য বুলগেরিয়াসহ অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে। ১৩৬৪ সালে মারিৎজা নদীর

সন্নিকটে সম্মিলিত বাহিনী শোচনীয়ভাবে তুর্কীদের হাতে পরাস্ত হয়। ইসলামের দুর্জয় অভিযানকে ঠেকানোর শক্তি তখন কারো ছিল না। বুলগেরিয়ার রাজা কার্ল সুলতান প্রথম মুরাদের সাথে নিজ কন্যাকে বিবাহ দিয়ে এবং সন্ধি চুক্তি করে তুর্কী সাম্রাজ্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু কিছুকাল পর বুলগেরিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে সুলতানের সাথে শত্রুতা আরম্ভ করে। ১৩৮৫ সালে প্রথম মুরাদ বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সামাকর্ভে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সোফিয়া মুসলিম অধিকারে আসে। ১৩৯৩ সালের মধ্যে সমগ্র বুলগেরিয়ায় মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সময় আনাতোলিয়া থেকে বহু মুসলমান বুলগেরিয়ায় এসে বরবাস শুরু করে। এদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় বুলগারগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ পর্যন্ত বুলগেরিয়ায় মুসলমানদের সার্বিক কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার তার বাহিনীকে বুলগেরিয়ায় প্রেরণ করলে রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৭৭ সালে রুশ বাহিনী দানিয়ুব অতিক্রম করে বুলগেরিয়ার শস্য-শ্যামল অঞ্চল দবরুজা দখল করলে প্রথমে আড্রিয়ানোপালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি ও পরে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সানস্টিফানো সন্ধি (Treaty of sanstefano) স্বাক্ষরিত হয় এবং বুলগেরিয়া স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৮৮৭ সালে প্রিন্স প্রথম ফার্ডিনান্ড শাসক হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ১৯০৮ সালের ৫ অক্টোবর বুলগেরিয়ায় স্বাধীন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বুলগেরিয়া জার্মানীর সাথে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং যুদ্ধ শেষে প্রচুর ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য হয়। ১৯১৮ সালে ফার্ডিনান্ড সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র তৃতীয় জার বরিস সিংহাসন লাভ করেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে বরিস দেশে একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালে বুলগেরিয়া নাৎসীদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস দখল করে। ১৯৪৩ সালের ২৮ আগষ্ট জার বরিস রহস্যজনকভাবে মারা যান। জার বরিসের পুত্র দ্বিতীয় সিমন সিংহাসন লাভ করেন। রাশিয়া ১৯৪৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। চাপে পড়ে বুলগেরিয়া অক্ষ শক্তির পক্ষ ত্যাগ করে। রাশিয়ার সাথে বুলগেরিয়ার শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর কিমন জর্জিয়েবের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কিন্তু শ্রীঘ্রই রুশপন্থী ষড়যন্ত্র পেকে উঠে। ১৯৪৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ায় রুশপন্থী ফ্যাসিবাদী কমিউনিস্টরা ক্ষমাতাসীন হয়। বস্তুত এসময় থেকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে বুলগেরীয় মুসলমানদের উপর নির্যাতন নেমে আসে। ১৯৫০ সাল নাগাদ এক নাগাড়ে বুলগেরিয়ার মুসলমানদের উপরে চলে নিপীড়ন, নির্যাতন, বহিস্কার। ফলে বহু মুসলিম বুলগেরিয়া হতে

অন্যদেশে গমন করেন এবং তারা বুলগেরিয়ার মুসলমানদের উপর কমিউনিস্টদের নির্যাতনের সংবাদ সর্বত্র প্রকাশ করতে থাকেন। পূর্ব ইউরোপে বুলগেরিয়া কমিউনিস্ট সরকারই মুসলমান নাগরিকদের উপর সবচেয়ে বেশী নির্যাতনকারী হিসাবে চিহ্নিত। সংখ্যালঘু মুসলমানদের আদর্শিক আশা আকাংখা নস্যাত করে দেয়ার জন্য যতকিছু করা দরকার তার সবই প্রয়োগ করেছে বুলগেরিয়ার ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট জালেম সরকার। এদিকে ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বলশেভিকীকরণের আমলে বুলগেরিয়ার মুসলমানদের বুলগেরীয়করণ শুরু হয়। ১৯৭০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির এক ইশতাহারে মুসলমানদের শ্লাভ জাতির সাথে মিশে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। মুসলমানদের ইসলামী নাম বাদ দিয়ে স্থানীয় বুলগেরীয় নাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। নারী ও পুরুষের জন্য ইসলামী পোষাক পরিধান নিরুৎসাহিত করা হয়। মুসলমানী খাতনা বেআইনী ও দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। রোযাকে অবৈজ্ঞানিক ও সমাজবিরোধী বলে সর্বত্র অপপ্রচার চালানো হতে থাকে। এমনকি মুসলমানদের লাশ তাদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাফনেরপরিবর্তে বাক্সে পুরে কবরে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। দেশের অধিকাংশ মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। অনেক মুসলিম-প্রধান জনপদ হতে মসজিদ নিশ্চিহ্ন করা হয়। রাজধানী সোফিয়া শহরে একটি মাত্র মসজিদ রেখে বাদবাকী মসজিদগুলি হয় যাদুঘরে না হয় কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে রূপান্তরিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ আবুদী বলেন, "Most of the mosques have been closed down. Only one mosque out of thirty remains in sofia. Most of these mosques have been converted into museums and government centres, some into churches and others destroyed under the pretext of land utilization" এ ধরনের নির্যাতন মূলক বর্বর তৎপরতা এখনো থামেনি। এই সেদিন ১৯৮৫ সালে শুধুমাত্র সেমোলিয়ান শহরেই ১০টি মসজিদ কমিউনিস্ট সরকার ধ্বংস করে দেয়। বুলগেরীয় কমিউনিস্টদের নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্যই বুলগেরিয়ার বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টিকারী তুর্কী বংশোদ্ভূত ভার উত্তোলনকারী নাঈম সুলেমানভ মুক্ত বিশ্বে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ায় যেসব মুসলমান বসবাস করছেনতাদের অধিকাংশই ইসলামের শাশ্বত বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের বেশীর ভাগই ছিল খৃষ্টান। কোন প্রকার জোর জবরদস্তি করে কোন খৃষ্টানকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয়নি। তাদের মধ্যে তুর্কী বংশোদ্ভূত নয় এমন পূর্ব ইউরোপীয় মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ

করে। তখন গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মুসলমান বৃদ্ধির জোয়ার প্রচন্ড রূপ ধারণ করে সুলতান মুহাম্মদ মেহমেদ (চতুর্থ)–এর সময়ে। তখন ১৯৬৬ সাল। বুলগেরিয়ার এইসব মুসলমানকে "নতুন মুসলমান" (ডনমি) বলে আখ্যায়িত করা হয়। এইসব নতুন বিশ্বাসীরাই বুলগেরীয় সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতনের শিকার। বর্তমানে এইসব নতুন মুসলমানদের প্রায় এক লাখ হচ্ছে বুলগেরীয় মুসলিম এবং প্রায় এক মিলিয়ন হলো তুর্কী মুসলমান।

বুলগেরীয় মুসলমানদের জন্য আরেকটি সমস্যা হলো সমাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতি খৃষ্টান এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের যোগসাজস। সরকার এই দুই সম্প্রদায়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ওদিকে মুসলমানদের উপর সরকার তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। বুলগেরিয়ার একজন কমরেড তার একটি গবেষণা রিপোর্টে সম্প্রতি মন্তব্য করেছে, "বুলগেরিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠির ভিত্তি অনেক মজবুত এবং তারা খুবই শক্তিশালী।" অন্য একজন মুসলিম বিদ্বেষী কমরেড জেড নুরইভা তার রচিত 'বুলগেরীয়ায ইসলাম' বইতে লিখেছেন, 'Islam in Bulgaria had and has a reactionary face. To over come Islam in Bulgaria is very difficult and complicated process. We have to destroy the basis of the Islamic way of life, Muslim tradition, style of thinking, mentality and identity. The process of destruction of Islam in Bulgaria has not yet reached a level of the similar process of annihilation of Christainity in Bulgaria. বুলগেরিয়ার গোঁড়া গীর্জাপন্থী এবং কমুনিষ্ট জনগণ নূরাইবার এই সম্ভাবনাকে খুব গভীরভাবেই উপলব্ধি করে এবং ইসলামকে ঠেকানোর পথ ও পন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এদিকে সরকার বুলগেরিয়ার যে কোন ধর্মীয় কার্যকলাপ চালানোর উপর কড়াকড়ি আরোপ করেছেন। "কাউন্সিল অব মিনিষ্টারস"–এর সাথে সম্পৃক্ত "Committee for Religious affairs"–এর অনুমোদন ছাড়া ধর্মীয় কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে কোন অফিস নেয়া এবং ধর্মীয় প্রচারণা চালানো সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে মূলতঃধর্মীয় স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে এবং ধর্মনেতাদের কমুনিষ্ট রাষ্ট্র এবং দলের মুখপাত্রে পরিণত করা হয়েছে। শুধু মুসলমানরাই নয়, রাষ্ট্রের সাথে যোগসাজস করতে গিয়ে অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীরও কম ক্ষতি হয়নি। বর্তমানে বুলগেরিয়ায় কোন রোমান ক্যাথলিক গীর্জাই খোলাই নেই। ১৯৫২ সালে চল্লিশ জন রোমান

পোশাক–পরিচ্ছদে ইসলামী চিহ্নটুকুও যাতে না থাকে তার জন্য সতর্ক প্রচেষ্টা চালায়। তাতেও সরকার ব্যর্থ হয়। জনগণ সরকারের সকল নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে নিজেদের পোশাক ঠিক রাখার চেষ্টা করে। পি জুরুনেভ নামক একজন লেখক বলেছেন, "Bulgarian Muslims women wear veils on their face and Muslims men wear sunni dress because they want to show their religious identity.

তবে এর জন্য মুসলমানদের প্রচুর রক্ত দিতে হয়েছে, বিলিয়ে দিতে হয়েছে তরতাজা বহু জীবনকে। ১৯৬৪ সালে সরকারী বর্বর সৈন্যরা তাদের প্রভূদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য মুসলমানদের উপর ট্যাংক পর্যন্ত চালনা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯৭১ সালে বুলগেরীয় পুলিশ মুকিয়াতে ৫০ জন মুসলিম বিক্ষোভকারীকে কারাগারে প্রেরণ করে। যারা নাম পরিবর্তনে রাজী হযনি তাদের কাউকে পনের বা কাউকে বিশ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। এত কিছুর পরও কমুনিষ্ট সরকারের ইসলাম বিরেধী যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করেনি। সরকারের এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুসলমানরা দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরও নিজস্ব ঐতিহ্য ও গৌরব নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু কমুনিষ্ট নির্যাতন এখনও থেমে যায়নি। বুলগেরিয়ায় মুসলিম নিধন, নির্যাতন এবং অত্যাচারের মর্মস্পর্শী কাহিনী এক হৃদয়বিদারক ইতিহাসের সূচনা করেছে। সে দেশের মুসলমানরা জানে না এই নিপীড়ন কবে নাগাদ শেষ হতে পারে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার প্রধানরা এই বর্ণনাতীত নিপীড়ন বন্ধ করার প্রচেষ্টা নিয়ে এখনও এগিয়ে না আসায় বুলগেরিয়ার নাস্তিক শাসকগোষ্ঠী বেপরোয়া হয়ে উঠছে দিন দিন। মুসলমানদের এ ব্যাপারে তাই এখন সজাগ হওয়া প্রয়োজন। দায়িত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্বের শাশ্বত বন্ধনকে অটুট রাখার জন্যও চেষ্টা করা অত্যধিক প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশের মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানরা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন এটাই সবার প্রত্যাশা।

জন রোমান ক্যাথলিক নেতাকে গোয়েন্দাগিরির অপরাধে অভিযুক্ত করা হলে সবাইকে জেলবন্দী করা হয়। বর্তমানে ষাট হাজারের মত রোমান ক্যাথলিক বুলগেরিয়ায় বসবাস করলেও তাদের পক্ষে কোন গীর্জায় সমবেত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রোটেস্টান্টরাও একই ধরনের জুলুমের শিকার হচ্ছে বুলগেরিয়ায়। কমিউনিস্ট সরকার এদের বহু স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদের সব ধরনের তৎপরতার উপর কড়াকড়ি আরোপ করেছে।

মুসলমানরা ছিল বুলগেরিয়ার বৃহত্তর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। কমুনিষ্ট সরকারের জন্য ইসলাম অসহনীয় বলে মনে হওয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে নির্যাতনের ষ্টিম রোলার। ১৯৫০-৫১ সালে কমুনিষ্ট সরকার বলপূর্বক এক লাখ পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে তুরস্কে তাড়িয়ে দেয়। এদিকে ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে কমুনিষ্ট সরকারের সাথে ' The grand Mufty of Bulgaria'-এর এক চুক্তি অনুযায়ী পঁয়ত্রিশ হাজার রোমেলী তুর্কী মুসলমান তুরস্কে তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরে যায়। এখনও বুলগেরিয়ার এগার শতাংশ লোক মুসলমান। তবে কমুনিষ্ট সরকারের পরিকল্পনা হলো যতশীঘ্র সম্ভব মুসলমানদের অস্তিত্বকে নির্মূল করে দেয়া।

বুলগেরিয়ার প্রায় সব মুসলমানরাই কমিউনিজম বিরোধী। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক বলশেভিক বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছিল তখনও বুলগেরিয়ার মুসলমানরা এই বিপ্লবের প্রতি মোটেও আকর্ষণবোধ করেনি। বরং মুসলিম ওলামাদের দ্বারা সেখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠী খুবই প্রভাবিত। তাদের বক্তব্য হচ্ছে- Our Muslim flag is green; not red, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময়ও বুলগেরিয়ার ওলামারা তাদের দেশে রুশ সাম্রাজ্যবাদকে অনুপ্রবেশের প্রচন্ড বিরোধীতা করেছিল এবং ইসলামকেই তাদের জীবন পদ্ধতি হিসেবে মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল। মুসলমানদের একমাত্র পত্রিকা 'ভুলা'ক'-এ প্রতিদিন প্রকাশিত একটি শ্লোগান থেকেই মুসলমানদের মনের কথাটি প্রকাশ পায় তা হলো-"As long as the Holy Quran exists we will oppose those who pray in the direction of the new kibla-Moscow".

অবশ্য ১৯৪৫ সাল থেকে এই পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানদের এই দৃষ্টিভঙ্গি কমুনিষ্ট শাসনের দীর্ঘকাল পরও বিলীন হয়ে যায়নি। বুলগেরিয়ার সমাজতান্ত্রিক সরকার মুসলমানদের উপরবিভিন্নভাবে নির্যাতন চালিয়েও যখন তাদেরকে দমন করতে পারেনি তখন সরকার মুসলিম নামগুলোও পর্যন্ত পরিবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, মুসলিমজনগণের

যুগোশ্লাভিয়ার বিপন্ন মুসলিম

সমাজতান্ত্রিক ফেডারেল যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র বলকান পেনিনসুলায় অবস্থিত। আড্রিয়াটিক সাগরতীরে ইতালীর বিপরীত দিকে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি প্রাচীনতম গোলযোগপূর্ণ এলাকা নিয়ে ১৯১৯ সালে যুগোশ্লাভিয়া গঠিত হয়। এটি কর্তমানে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট ব্লকভুক্ত দেশ হিসেবেই পরিচিত। ইতালী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া,বুলগেরিয়া, গ্রীস ও আলবেনিয়া দ্বারা যুগোশ্লাভিয়া পরিবেষ্টিত। আয়তন ২৫৫৮০৪ বর্গ কিলোমিটার (৯৮৭২৫ বর্গমাইল), জনসঙখ্যা আড়াই কোটি। রাজধানী বেলগ্রেড। মুদ্রা দিনার। ভাষা সার্বো, ক্রোয়াট, শ্লোভিন, ম্যাসিডনিয়ান। জনগণের একাংশ নাস্তিক কমিউনিস্ট হলেও ব্যাপক জনগণ খ্রীষ্টান (গ্রীক অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক), মুসলিম ও ইহুদী।

যুগোশ্লাভিয়া ৬টি রিপাবলিক ও ২টি স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশ নিয়ে গঠিত। রিপাবলিক সমূহ হচ্ছে ১· সার্বিয়া (রাজধানী বেলগ্রেড) ২· ক্রোটিয়া (রাজধানী জাগরেব) ৩· বসনিয়া হারজেগোভিনা (রাজধানী সারাজোভা) এটি দেশের বৃহত্তম রিপাবলিক। এর আয়তন ১৯৭৪১ বর্গমাইল। অতীতে হারজেগোভিনা আলাদা প্রজাতন্ত্র ছিল। পরে বসনিয়ার সাথে একে একত্রিত করে দেয়া হয়। এই রিপাবলিক মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ। এখানকার মোট জনসংখ্যার ৬০% মুসলিম। ৪· ম্যাসিডনিয়া (রাজধানী স্কোপজি) ৫· স্লোভেনিয়া (রাজধানী লুজুবিলিয়ানা) ৬· মন্টিনিগ্রো (রাজধানী টিটোগ্রাড) স্বায়ত্বশাষিত প্রদেশ দুইটি হচ্ছে ১· কসোভো (রাজধানী প্রিমটিনা) ২· ভয়ভোদিনা (রাজধানী নবীসাদ)। সার্বদের দুর্বল করার জন্য মার্শাল টিটো এ দু’টি প্রদেশকে আলাদা করে স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশে পরিণত করেন।

যুগোশ্লাভিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ফেডারেল এসেম্বলীই সরকারের ও সামাজিক স্ব–ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ অঙ্গ। কমিউনিস্ট পার্টি একমাত্র রাজনৈতিক দল এবং এ দলই রাষ্ট্র ও সরকারকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজাতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট ছিলেন জোসেফ ব্রজ টিটো। টিটো ১৯৪৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী যুগোশ্লাভিয়ার শাসনভার গ্রহন করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালের ১৭মে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে সংশোধিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন। ১৯৮০ সালের ৪ঠা মে ৩৫ বছর দেশ শাসনের পর টিটো মারা যান।

যুগোশ্লাভিয়ার অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর (৮৫% লোকের পেশা কৃষি)। প্রচুর পানি বিদ্যুৎ, বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে দেশগুলিতে। গম, চিনি, তামাক, বীচ, আফিম, ভাং কৃষিজাত দ্রব্যঃ যন্ত্রপাতি, কাঠ, গোশত ও তামাক প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। তৈল, তৈলজাত দ্রব্য সামগ্রী, ইস্পাত, কলকবজা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী করা হয়।

যুগোশ্লাভিয়া বর্তমানে মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। দেশটি ঋণভারে জর্জরিত। যুগোশ্লাভিয়ার ঋণের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার। ইতিমধ্যে জীবন যাত্রার মান হ্রাস পেয়েছে ৩০ শতাংশ। মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে শতকরা ১০০ ভাগ, আর প্রায় ২০ লাখ অধিবাসী যাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৫ ভাগ, বলতে গেলে কর্মহীন, বেকার। যুগোশ্লাভিয়া পশ্চিমা ঋণের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় ১৯৮০–৮৭ সালে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কমে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ কমে যাবার ফলে, দেশের জীবন যাত্রার মান ৩০ ভাগের অধিক নীচে নেমে আসে। দেশে চরম মুদ্রাস্ফীতি ও সামাজিক অসন্তোষ এক বিস্ফোরণ ঘটার অপেক্ষায়। সরকার দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক অব্যবস্থার মুকাবিলা করতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। দেশের কোন কোন এলাকা খুবই উন্নত, আবার কোন কোন এলাকায় অনুন্নতির এক শেষ।

জাতিসত্তার বিচারে যুগোশ্লাভিয়া বলতে গেলে বহুজাতিক দেশ। কম বেশী দেড় ডজন জাতিসত্তা; আর আধা ডজন ভাষা তাদের মধ্যে প্রচলিত। জাতিগুলোর মধ্যে বহুকালের রক্তাক্ত সংঘাত ও বিরোধিতার ইতিহাস আছে। একক জাতি গঠনের প্রতিকূল অবস্থায় আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার জনক ও ক্রোয়াট জাতি সম্ভূত ব্যক্তিত্ব মার্শাল যোসিফ ব্রোজ টিটো ১৯৭৪ সালের সংবিধানে দেশ শাসনের এমন বিধান বিধিবদ্ধ করেন যাতে ফেডারেল রিপাবলিকগুলিতে জাতীয়তার ভিত্তিতে লোকসংখ্যা যতই হোক না কেন, দেশ শাসনে সমান ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। টিটো পরবর্তী যুগে যৌথ নেতৃত্বও প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু কার্যত ফেডারেল ব্যবস্থায় অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের জাতিসত্তাগুলোকে দমিত করার ব্যবস্থাই তাতে পাকাপোক্ত করা হয়েছে। তাই এদেশে এখন জাতিতাত্ত্বিক ক্ষমতার এক জোর লড়াই শুরু হয়েছে। সার্ব বনাম আলবেনীয়, সার্ব বনাম ক্রোয়াট বিরোধ এখন কর্মী শ্রমিক বিক্ষোভ মিছিল, আচমকা ধর্মঘট, খন্ড লড়াই ইত্যাদি নিত্যকার ঘটনায় রূপ নিয়েছে। সার্বরা যুগোশ্লাভিয়ার সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী (৯০ লক্ষ)। যুগোশ্লাভ সেনাবাহিনীর পুরোটাই সার্বদের দখলে। বেলগ্রেডও সার্ব অঞ্চলে।

যুগোশ্লাভিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ও ইসলাম

যুগোশ্লাভিয়ার অঙ্গ রিপাবলিক সার্বিয়া, বসনিয়া ও ম্যাসিডনিয়ার রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। সার্বরা আদিতে সার্বিয়ায় এসেছিলেন নীপার, ওডার উপত্যকা ও কার্পথীয় অঞ্চল থেকে। সার্বদের সাথে ক্রোয়াট, শ্লোভেনস, বসনিয়ান ইত্যাদি জাতিসত্তার অনেক মিল থাকলেও অনেক অমিলও রয়েছে। এই সার্বরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে অক্ষশক্তির পক্ষ নেয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, সার্বিয়ার পিন্স আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হবার ঘটনার পথ ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। আর এই সার্ব বংশের রাজারাই এক সময় ক্রোয়াটদের উপর প্রভুত্ব করে। টিটো ছিলেন ক্রোয়াট জাতিসম্ভূত এবং তিনি সার্বদের ক্ষমতা খর্ব করেন। বসনিয়া, হারজেগোভিনা, কসোভোরও রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য। আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার কোন অস্তিত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ছিল না। প্রায় পঁচিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ও অস্থির ইতিহাসের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়া রুশ প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৫ সালের ২৯ নভেম্বর মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেল প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। এর আগে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ দেশটি জাতিসংঘের সদস্য ভুক্ত হয়। মহানবী (সাঃ)-এর সময়েই যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশে ইসলামের আহবান এসে পৌছে। আরব ব্যবসায়ী ও মুবাল্লিগরা প্রথম এ অঞ্চলে ইসলামের বাণী নিয়ে আসেন। হযরত উসমান (রা) এর শাসনামলে সিরিয়ার গভর্ণর মুয়াবিয়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে বিজয়াভিযান প্রেরণ করেন তার সূত্র ধরে ভূমধ্য সাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে এবং বলকান অঞ্চলে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়। এ সময় সার্বিয়া, বসনিয়া ম্যাসিডনিয়ায় বহু লোক ইসলাম কবুল করে। এছাড়াও ভলগা নদীর উপত্যকা অঞ্চল হতেও বহু মুসলিম এ সময় বসনিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, অর্থনৈতিক লেনদেন, উন্নত চরিত্র মাধুর্য ইত্যাদির মাধ্যমে আগত মুসলিমগণ স্থানীয় জনগণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বলকান অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যকার কলহ ও অনৈক্য জনিত রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করণে ফলপ্রসু অবদান রাখে। আধুনিক যুগোশ্লাভিয়া যে সব অঞ্চল নিয়ে গঠিত তার অধিকাংশ এলাকা ১৩৮৯-১৯১৩ সাল পর্যন্ত উসমানীয় তুর্কী মুসলিমদের শাসনাধীন ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু হতে তুর্কী মুসলিম বাহিনী ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত বলকান অঞ্চলগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। অটোমান শাসক ওরখানের শাসনামলে (১৩২৬-৫৯) প্রথম বলকান অঞ্চলে অভিযান সাফল্যমন্ডিত হয়। প্রথম মুরাদের শাসনামলে (১৩৫৯-৮৯) ১৩৬৮

সালে ম্যাসিডনিয়ার কিয়দংশ তুর্কী শাসনাধীনে আসে। পরবর্তী বৎসর মারিৎজা নদীর সন্নিকটে তুর্কীগণ খৃষ্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা করে তাদেরকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। ফলে সমগ্র ম্যাসিডনিয়া তুর্কীদের পদানত হয়। এই বিজয়ের পর সুলতান প্রথম মুরাদ বলকান পর্বত অতিক্রম করে সার্বিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সার্বগণ তাঁর আধিপত্য মেনে বার্ষিক কর দানেসম্মত হয়। কিছুকাল পর সার্বিয়া সুলতানের সাথে সন্ধি ভঙ্গ করে শত্রুতা আরম্ভ করে। এতে মুসলিম বাহিনী পুনরায় সার্বদের বিরূদ্ধে অগ্রসর হয়। সামাকর্মে উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খৃষ্টানগণ পরাজিত হলে সার্বিয়ার সোফিয়া ও নীস মুসলিম কর্তৃত্বাধীনে আসে। সার্বিয়ার রাজা লাজারাস মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৩৮৯ সালে মুসলমানরা কসোভোতে তার মুকাবিলা করে। কসোভোর যুদ্ধে সার্বরা পরাজয় বরণ করে। কসোভোর যুদ্ধ বলকান অঞ্চলে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক মীমাংসাত্মক ঘটনা। এতে মুসলিম শক্তির প্রাধান্য প্রমাণিত হয় এবং ইউরোপে ইসলামের বিজয়াভিযান পরিচালনায় নতুন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়। এ বিজয়ের ফলে সার্বিয়া, বসনিয়া ও ম্যাসিডনিয়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কসোভো যুদ্ধক্ষেত্র ছিল বলকানের ওয়াটারলু (Waterloo)। এখানে পাঁচশত বছরের জন্য তুর্কীদের সাথে সার্ব ও শ্লাভজাতির ভাগ্য নির্ণীত হয়। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের শাসনামলে (১৪৫১–৮১) ১৪৫৪ সালে ভার্না নামক স্থানে খৃষ্টানদের সাথে এক ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে সমগ্র বসনিয়া মুসলিম অধিকারে আনেন। বসনিয়ায় সরাসরি তুর্কী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আড্রিয়াটিক সাগরের উপরও মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৮১ সালে হারজেগোভিনা মুসলিম শাসনাধীনে আসে। সুলতান সুলাইমানের (১৫২০–৬৬) ৪৬ বছরের গৌরবময় রাজত্বকালে ১৫২১ সালে ’বেলগ্রেড অধিকৃত হয়। এসময় মুসলিম নৌশক্তি আড্রিয়াটিক সাগর ও ভূমধ্য সাগরে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করে। খায়রুদ্দীন বারবারোসা এসময় মুসলিম নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৫২৮সালে জাজাসি মুসলিম অধিকারে আসে। মুসলিম বিজয়ের পর এসব অঞ্চলের জনগণ দলে দলে ইসলামের সুমহান বাণী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৫৩০ সালের মধ্যে সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় আনাতোলিয়া, আলবেনিয়া থেকে বহু মুসলিম এসে যুগোশ্লাভিয়ায় বসবাস করতে থাকেন। স্থানীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানরাই তাদের এলাকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । শুধু তাই নয় উসমানীয় সালতানাতের অধীনেও তারা নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত

ছিলেন। একজন বসনীয় মুসলিম মুহাম্মাদ সাকোলু তুর্কী সুলতানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন অংশে অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে রুশ ষড়যন্ত্রে সার্বিয়া, বসনিয়াসহ অন্যান্য মুসলিম শাসনাধীন এলাকায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের ২৮জুন সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি অনুযায়ী শ্লাভ অধ্যুষিত বসনিয়া ও হারজেগোভিনাকে অস্ট্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করে সার্বিয়ার সাথে যুক্ত করে যুগোশ্লাভিয়া নামক নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়। সে থেকে পৃথিবীর ভূগোলে যুগোশ্লাভিয়া নামটি আজও চলে আসছে। সমাজতন্ত্র যুগোশ্লাভিয়ায় জাতিগঠনে ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই যুগোশ্লোভিয়ার স্পর্শকাতর ঐক্য বিভিন্ন জাতিসত্তায় অসন্তোষ, অভ্যুত্থানের আশংকায় আজ হুমকির সম্মুখীন।

মুসলমানদের উপর নির্যাতনঃ

যুগোশ্লাভিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর (১৯৪৫ সালে) সমাজতন্ত্র কায়েম হলে সে দেশের ইতিহাসে রচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। মুসলমানদের উপর চালানো হয় নির্বিচার নির্যাতন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্শাল টিটোর অনুগামী কমিউনিস্ট ও সার্বিয়ান টিটানিক খৃষ্টানদের হাতে শাহাদাত বরণ করে ১০ লাখ নিরীহ মুসলমান। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রীকরণ কার্যক্রম যখন শুরু হয় তখন থেকেই যুগোশ্লাভ মুসলমানরা হয়ে আসছে চরমভাবে বঞ্চিত এবং নির্যাতিত। কম্যুনিস্ট শাসন চালুর পর টিটো তারই সহকর্মী যোদ্ধা আদিল জুলফিকার পেসিককে (বসনিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী) পর্যন্ত শুধু মুসলমান হবার কারণে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। অপর একজন মুসলিম নেতাকে ইসলামী কার্যক্রম পরিচালনা করার অপরাধে ১৯৬২ সালে প্রবাস গ্রহণে বাধ্য করা হয়। তেওফিক নামে এই মুসলিম নেতাকে ১৯৪৯ সালে ১৫ বছরের কারদন্ড প্রদান করা হয়েছিল। দশ বছর কারাভোগ করার পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হলেও কম্যুনিস্ট দমননীতির মুখে তিনি '৬২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় পলায়ন করেন এবং সেখানে প্রবাস জীবন যাপন করছেন।

১৯৪৯ সাল। একটি স্কুলে ইসলামী তৎপরতা চালানোর তথ্য পেয়ে সমাজতান্ত্রিক সরকার সেখানকার চারজন মুসলমানকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে। দু'জন নির্যাতনের মুখে শাহাদাত বরণ করেন এবং ৫০০ জন সদস্যকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। যে কেউ যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করলেই তাদেরকে সমাজতান্ত্রিক বন্দী জীবনের অন্তরালে নিক্ষেপ করা হয় অনায়াসেই। মুসলিম নেতা, ধর্মীয়

ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা জেলখানাগুলো ভর্তি করা হয়। ১৯৮০ সালের কথা। স্কুল ছেলেমেয়েদের জন্য হালাল খাদ্যদ্রব্য বিতরণের দাবী জানানোর অভিযোগে গোরাজ মসজিদের ইমাম মোহারেম হাসানভিগোভিক, মসজিদের কোষাধ্যক্ষ আগো ছোরেভাটসকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয। ব্যক্তিগত পাঠাগারে মুসলিম লেখকের ইসলামী বই রাখার অপরাধে অপর এক ইমাম ইসমাইল সেলিমো'ভকে শাস্তি দেয়া হয়। তাছাড়া একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিককে ১৪ কছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে যুগোশ্লাভ সরকার। তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার পরও সারাজিবুতে গৃহবন্দী করে রাখা হচ্ছে। তাঁর নাম আলীজা নিমেটাক। অপর এক আলবেনীয় বুদ্ধিজীবী ডঃ আদম ডিমাসি কারাগারের বন্দীজীবনে তার দৃষ্টিশক্তি বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন। যুগোশ্লাভ মুসলমানদের উপর হতে নির্যাতনের ভার লাঘব করার দাবী সম্বলিত এক স্মারকপত্র তৈরীর অপরাধে ১৯৮১ সালে এক দম্পতি জেবুক এবং সুবহাইয়া কনিককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বর্ণনায় যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলমানদের জীবন অত্যন্ত করুণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ্যামনেস্টির এক বিবরণে বলা হয, ১৯৮১ সালের দিকে ১৩ বছরের একজন মুসলমান ছেলেকে পুলিশ এমন মারাত্মকভাবে প্রহার করে যাতে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ সে আর সুস্থ হতে পারেনি।

মার্শাল টিটোর মৃত্যুর পর যুগোশ্লাভিয়ার এই মুসলিম নির্যাতন কমেনি বরং প্রচন্ড গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় মুসলমানরাও সক্রিয় হয়ে উঠে। ফলে ১৯৮১ সাল হতে কম্যুনিস্ট সরকার তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের উপর। প্রশাসন নির্বিচারে মুসলমানদের হয়রানি শুরু করে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগ এনে মুসলিম জনগণকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। ১৯৮১ সালে দু'হাজার আলবেনীয় মুসলমানকে হত্যা করে যুগোশ্লাভ সরকারী সেনার লোকজন। কম্যুনিস্ট সরকার উৎখাতের চেষ্টা করা হয়েছে এমন অবান্তর অভিযোগ এনে সরকার ১৯৮১ সালে সহস্রাধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করে। ১৯৮৩ সালের ২০শে আগস্ট যুগোশ্লাভিয়ায় ১২ জন মুসলিম নেতাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে একজন ইমাম এবং দু'জন মহিলাও রয়েছেন। খবরে প্রকাশ, এসব মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারের প্রহসন চালানো হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই ছিল দীর্ঘস্থায়ী মামলা। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, এরা যুগোশ্লাভিয়ার বসনিয়া, হারজেগোভিনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের চক্রান্ত করছিলেন।

১৯৮৫ সালে এসেও যুগোশ্লাভ সরকার এ মুসলিম নির্যাতনের ধারাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করেননি। ১৯৮৫ সালেও মুসলিম নেতা সাইক আড় গলিককে চার বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৮৫ সালে বসনিয়ার আরো চারজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়। এরা হচ্ছেন ইব্রাহীম খলিল (৭১), মেহরাক জেকানভিক (৫১), ইব্রাহীম জেকানভিক এবং রামী জেকানভিক। এদের প্রথম জনকে ২ মাসের কারাদন্ড, দ্বিতীয় জনকে ২০ দিনের কারাদন্ড, তৃতীয় জনকে ৬৫ দিনের কারাদন্ড ও ১৫০০ দিনার জরিমানা এবং চতুর্থ জনকে ৫২ দিনের কারাদন্ড এবং ২৫০০ দিনার জরিমানা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সরকার সারাজেভোতে আরো এগার জন মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার এবং কারাদন্ড প্রদানের কথা ঘোষণা করে। এদের মধ্যে দু'জন ইমামও রয়েছেন। গ্রেফতারকৃত এসব ব্যক্তিরা হচ্ছেন-১· মুস্তাফা সেপহিক (৩৩), ২· হাসান ওকেনজিক (২৮), ৩· বিজ্ঞানের প্রফেসর সালেহ বিহিমিন (৬৪), ৪· একজন অবসরপ্রাপ্ত আইনজীবী আলী আইজেটবিজোভিক (৫৮), ৫· ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আদেম বিকাকিক (৩১), ৬· আইনজ্ঞ দরবেশ জুরজেভিক (৩৭), ৭· ইসমত কুসানমাজিক (৫৫), ৮· ইমাম মুস্তাফা পাহিক। এভাবে মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার জন্য যুগোশ্লাভ সরকার এবং প্রশাসন বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, চালাচ্ছে নিপীড়ন, জেল, হত্যা এবং পাশবিক অত্যাচার।

কিন্তু তারপরও মুসলমানদের দাবিয়ে রাখা সে দেশের সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়নি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রভাব এর মধ্য দিয়েও দিন দিন বেড়েই চলছে। ইসলামের এ ক্রমবর্ধমান প্রভাবে শাসক গোষ্ঠি এখন বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার দক্ষিণ ও মধ্য অঞ্চলের তিনটি এলাকাই সরকারের এই উদ্বেগের কারণ। এলাকা তিনটি হচ্ছে বসনিয়া, হারজোগোভিনা, ম্যাসেডোনিয়ার অংশ বিশেষ ও কসোভা। তিনটি এলাকাতেই তুর্কী উসমানীয় শাসনের প্রভাব বিদ্যমান। ক্ষমতাসীন কম্যুনিস্ট শাসকদের প্রতিরোধের মুখেও বেসরকারী পর্যায়ে স্থানীয় মুসলিমদের উদ্যোগে বসনিয়া ও হারজেগোভিনাতে অদ্যবধি চারশটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে ৩৮০টি মসজিদ নতুন করে নির্মিত হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ার মুসলমানদের এ যখন অবস্থা তখন দেশের অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে চলছে এক ভয়াবহ মন্দা। বিগত ক'টি বছর ধরে দেশে চলছে মারাত্মক অর্থনৈতিক দৈন্য এবং সামাজিক অস্থিরতা। বেকারত্বের চাপে দেশের মানুষ দিশেহারা। যুগোশ্লাভিয়ায় বর্তমানে শক্ত সমর্থশালী প্রায় এক মিলিয়ন শিক্ষিত যুবক বেকারত্বের চরম শিকার। প্রতি সাতজন শ্রমিকের একজন কোন কাজ কর্ম

পাচ্ছে না। দেশের মুসলিম এলাকাগুলোতে এ বেকারত্বের হার প্রায় ৫০ শতাংশ। দেশের অর্থনীতি এখন দেউলিয়া। মুদ্রাস্ফীতির ঘোড়া ছুটছে লাগামহীনভাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম ক্রয়ক্ষমতাকে হার মানিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে সামনে। যুগোশ্লাভ কমুনিজমের চল্লিশ বছর পর এখন জনগণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সমাজতন্ত্র তাহলে দেশকে কি দিতে পেরেছে? বিগত পার্টি কংগ্রেসেও এ প্রশ্নটিই করেছে আগত ডেলিগেটরা। তারা খোলাখুলিভাবেই টিটোর সমাজতন্ত্রী নীতির পরিণাম নিয়ে কংগ্রেসে প্রশ্ন তুলেছেন। তাদের মতে দেশকে সমাজতন্ত্রী করণের দিকে অগ্রসর করে এক বিপর্যয় ডেকে আনা হয়েছে যুগোশ্লাভিয়ায়। বিগত বছরগুলোতে দেশের যতটুকু অগ্রগতি বা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার পেছনে একমাত্র কারণ ছিল বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য যার চল্লিশ শতাংশ ঋণ এখন যুগোশ্লাভিয়াকে পরিশোধ করতে হচ্ছে। কংগ্রেস ডেলিগেটদের কিছু কিছু প্রতিনিধি দেশের বর্তমান অবস্থাকে পার্শ্ববর্তী দেশ অস্ট্রিয়া, ইতালী এবং গ্রীসের সাথে তুলনা করেছেন। এসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথে না গিয়েই বরং উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। তাই তারা এসব দেশের তুলনায় নিজেদের জনগণের জীবন মানের ক্রমাবনতিকে সমাজতন্ত্রের পরিণাম বলেই মনে করছেন।

সব মিলে যুগোশ্লাভিয়া এখন এমন এক দেশ যার মুদ্রাস্ফীতি ইউরোপে সবার শীর্ষে। বেকারত্ব সব ক'টি দেশকেই হার মানিয়েছে। সামাজিক অস্থিরতা ও রাজনৈতিক নিপীড়ন এতটা বেশী যে মানবাধিকারের ন্যূনতম চেতনাবোধ সেখানে বর্তমান নেই। জেল, জুলুম, নির্যাতন সেখানে নিত্যকার ঘটনা। আর জুলুম বা নির্যাতন বলতে মুসলিম নির্যাতনই হচ্ছে যুগোশ্লাভ সমাজতন্ত্রী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য।

যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলিম নির্যাতনের শেষ কবে হচ্ছে তা অবশ্য বলা মুশকিল। তবে এসব নির্যাতনের অবসানকল্পে সেখানকার মুসলমানরা কম চেষ্টাও করছেন না। বিভিন্নভাবে মুসলমানরা সেখানে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছেন। মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার জন্য মুসলিম ছাত্র তরুণদের সংগঠন ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন ((YMO) কাজ করার চেষ্টা করলেও এখনও তা নিষিদ্ধ ঘোষিত রয়েছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে ৫টি মহাদেশের ২০টি দেশে বসবাসরত যুগোশ্লাভ মুসলিমরা মিউনিকে একত্রিত হয়ে "ইউনিয়ন অব বসনিয়া মুসলিম" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এতে আদিল জুলফিকার পাসিক ও তওফিক ভেলাজিক যথাক্রমে প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। এ সংগঠন বর্তমানে নির্যাতিত যুগোশ্লাভ মুসলমানদের পক্ষে

বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনের চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি মুসলিম নেতা আদিল জুলফিকার যুগোশ্লভ মুসলমানদের ভবিষ্যত নিয়ে এক চমকপ্রদ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "শত নির্যাতন চালিয়েও মুসলমানদের নিবৃত্ত করা যাবে না। টিটোর মৃত্যুর পর দেশের যে অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে তাতে যেকোন সময় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি ভেংগে পড়তে পারে। আর এ অবস্থা সৃষ্টি হলে যুগোশ্লাবিয়ার মুসলমানরা যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।" আদিল জুলফিকারের এ মন্তব্যকে না ধরলেও কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় যে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে তা যুগোশ্লাভিয়াকেও জাগিয়ে তুলবে না এমনটি বলা যায় না। আর এ পরিবর্তনের ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠির বন্দী জীবনের ভার লাঘব হবে বলেই বিশ্বাস।

রুমানিয়ার মুসলমান

রুমানিয়া সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলকান পেনিনসুলায় অবস্থিত। কৃষ্ণ সাগরতীরে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি প্রাচীনতম এলাকা নিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ বলকান রাষ্ট্র হিসেবে রুমানিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এটি বর্তমানে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট ব্লকভুক্ত দেশ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আয়তন ২৩৭৫০০ বর্গ কিলোমিটার (৯১৬৫৪ বর্গ মাইল)। জনসংখ্যা আড়াই কোটি। রাজধানীবুখারেষ্ট।

জাতিসত্তার দিক থেকে রুমানিয়ান, মডিঅর, জার্মান, তুর্কী, তাতার হাঙ্গেরীয়ান, রুথনিয়ান বুলগেরিয়ান, জিপসী, ইউক্রেনিয়ান ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠিতে বিভক্ত। জনগণের একাংশ নাস্তিক কমিউনিষ্ট হলেও ব্যাপক জনগণ খ্রীষ্টান, মুসলিম ও ইহুদী।

রুমানিয়া ৪০টি প্রদেশ এবং হাঙ্গেরীয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে সৃষ্ট একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান কয়েকটি প্রদেশ হচ্ছে মোলদাবিয়া, ওয়ালাসিয়া, দবরুদিয়া, ট্রান্সসিলভানিয়া। প্রধান প্রধান শহর হচ্ছে ব্রাসভ, ক্লীজ, কনসটানটা, মাজিদিয়া, হামজাজিয়া, টেকীরকোল, মানগালিয়া। কার্পেথিয়ান পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে ট্রান্সসিলভানিয়া আল্পস পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলকে দুভাগে ভাগ করেছে। পর্বতমালার উত্তর ও পশ্চিমভাগে মালভূমি। দানিয়ুব নদীর শেষ ১৯০ মাইল রুমানিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণসাগরে পড়েছে।

রুমানিয়া একটি সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কমিউনিষ্ট পার্টি একমাত্র রাজনৈতিক দল এবং এ দলই রাষ্ট্র ও সরকারকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টই রাষ্ট্রপ্রধান। বর্তমান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন নিকোলাই চসেস্কু। প্রেসিডেন্ট চসেস্কু ১৯৬৫ সাল থেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের শাসনামল স্বাতন্ত্র্য মন্ডিত। ওয়ারশ জোটের মধ্যে থেকেও চসেস্কু সোভিয়েত মুরুব্বীয়ানাকে আমল দেননি। নিজস্ব স্বাধীনচিন্তা প্রকাশ করেছেন স্পষ্ট ভাষায়। ওয়ারশবাহিনী কর্তৃক ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযানে তাঁর ভিন্নমত প্রকাশ, ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত অভিযানের সরাসরি সমালোচনা এবং ১৯৮৪ সালে লসএঞ্জেলস এর অলিম্পিক বর্জনের সোভিয়েত আহবান প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে তিনি ক্রেমলিনের লালজারদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন।

চসেস্কুর আর একটি বৈশিষ্ট্য ওয়ারশ জোটে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনদিন রুমানিয়ার ভূমিতে ওয়ারশ জোটের সামরিক মহড়া তিনি হতে দেননি। ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মস্কোতে ওয়ারশ জোটের বৈঠকে ক্রেমলিনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার মাত্র তিনমাস আগে ব্রেজনেভ এই বিদ্রোহী সঙ্গীকে তুষ্ট করবার জন্য 'অর্ডার অব লেনিন' পদক প্রদান করেন। কিন্তু তবুও চসেস্কু সোভিয়েত পদক্ষেপের বিরোধিতার ঝুঁকি নিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হননি। জাতীয়তাবাদী ও একরোখা এই চসেস্কুকে বশে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ব্রেজনেভ, আন্দ্রোপভ, আর চেরনেনকো। গরবাচেভ এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

রুমানিয়ার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। প্রধান কৃষিপণ্য হচ্ছে কর্ন, গম, যব, রাই, হ্যাম্প, আলু, ফ্লাক্স, ইক্ষু, বীট, দ্রাক্ষা, তামাক ও সূর্যমুখী ফুল। প্রধান শিল্প গ্যাস, ভারী শিল্প ইস্পাত, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বস্ত্র, রাসায়নিকদ্রব্য, কাগজ, কাঠ, কৃষি যন্ত্রপাতি কারখানা। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে বগী, সিমেন্ট ও মূল্যবান কাষ্টদ্রব্য। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আকরিক লৌহ, লিগনাইট, কপার, স্বর্ণ, রৌপ্য ও ইউরেনিয়াম। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিজমের ব্যর্থতার কারণে রুমানিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত কয়েক বছর ধরেই এই সংকট চলছে। সম্প্রতি এই সংকট পূর্বের চাইতে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চরম খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। কিছুদিন আগে পূর্ব রুমানিয়ার শিল্পাঞ্চল শহর ব্রাসোভ এর শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার শত শত সৈন্য ও পুলিশ পাঠিয়ে শ্রমিক বিক্ষোভকে দমন করে। জিউ উপত্যকায় কয়লা খনিশ্রমিকদের বিক্ষোভও একই কায়দায় দমন করা হয়। শ্রমিকরা তাদের বেতন হ্রাস এবং খাদ্য ও গোশত উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের ব্যর্থতার জন্যই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। দেশটা বর্তমানে ঋণভারে জর্জরিত। রুমানিয়ার বিদেশী ঋণের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার। চসেস্কু এ ঋণের পরিমাণ কমানোর চেষ্টা করলেও তার পক্ষে ব্যাপক জনগনের জীবনযাত্রায় তেমন কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি।

রুমানিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ও ইসলাম

রুমানিয়া আজ যে সব অঞ্চল নিয়ে গঠিত তা একসময় রোমানদের উপনিবেশ ছিল। ১০০–২৭৫ সাল পর্যন্ত আজকের রুমানিয়া প্রদেশ দ্যাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলরা এ এলাকা ছেড়ে গেলে মোলদাবিয়া ও ওয়ালাসিয়া দুইটি পৃথক প্রিন্সিপালিটিতে পরিণত হয়। ১৪১১ সালে প্রথম এ অঞ্চলে মুসলিম বিজয়াভিযান প্রেরিত হয়। উসমানীয় তুর্কী সুলতান সুলায়মানের গৌরবময় শাসনকালে (১৫২০-৬৬) ১৫৪১ সালে ট্রান্সসিলভানিয়া বিজিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে রুমানিয়ার বৃহত্তর অংশ অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।

তবে রুমানিয়ায় ইসলামের আগমন ঘটে আরো বহু আগে। ঐতিহাসিক তথ্যে জানা যায় যে চেঙ্গীস খানের পৌত্র বারাকাত খানের প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের ব্যাপক জনগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ছাড়াও ১২৬২ সালে ১২ হাজার মুসলিম সেলজুক সৈন্য যখন রুমানিয়ায় প্রবেশ করে তখন রাজা তুন উরদু ও প্রিন্স সারিক সাতুং দাউসহ সমগ্র রাজপরিবার দ্বীন ইসলাম কবুল করে। এদের অনুকরণ করে প্রজারাও ইসলামের বাণীকে নিজেদের মুক্তির একমাত্র সনদ হিসেবে গ্রহণ করে। সম্প্রতি ডঃ মুহাম্মদ বিন নাসির আল আবুদী তাঁর এক গবেষণা প্রবন্ধে রুমানিয়ায় ইসলামের আগমন প্রসঙ্গে বলেছেন, Monuments existing In the Dobrudja area lend credence to thetheory that Islam entered Rumania before both Barakat Khan & seljuks in the middle of 13th century. দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত রুমানিয়ার অধিকাংশ এলাকা অটোমান তুর্কী সুলতান কর্তৃক শাসিত হয়। রাশিয়া, অস্ট্রিয়ার যৌথ চাপের মুখে ১৮৭৮ সালে অটোমান তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) মোলদাবিয়া, ওয়ালাসিয়া, ট্রান্সসিলভানিয়া থেকে সরে আসেন। ফলে এ অঞ্চলগুলো রুমানিয়া নামে অভিহিত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮১ সালে রুমানিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা হন প্রথম ক্যারল। রাজা দ্বিতীয় ক্যারল ১৯৩৮ সালে ডিক্টেটার হন। তিনি ১৯৪০ সালে শাসনভার ত্যাগ করেন। প্রথম মিখাইল ১৯৪০ সালে রাজা হন। তিনি কমিউনিস্ট চাপে ১৯৪৭ সালে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং বর্তমানে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। সম্প্রতি নববর্ষের এক বাণীতে রুমানিয়ার এই প্রাক্তণ রাজা পূর্ব ব্লকে উন্মত্ত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং কমিউনিস্ট দাসত্বের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অথচ কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ন হতে রুমানীয় জনগণের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

১৯৪৮ সালে রুমানিয়া কমিউনিস্ট ব্লকভুক্ত দেশে পরিণত হয়। ছলেবলে কৌশলে সোভিয়েত চররা এখানে ক্ষমতা দখল করে। সে থেকে বর্তমান অবধি কমিউনিস্ট পার্টির নামে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী পার্টি এলিটরা রুমানিয়ার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার পর মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছে।

রুমানিয়ায় ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রভাব সূচীত হয় অটোমান তুর্কী শাসনামলে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আবুদী বলেন, 'The main spread of Islam took place in Rumania under the almost five century rule of the Ottomans'। পরবর্তীতে আনাদুল অঞ্চল থেকে প্রচুর মুসলিম রুশ বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে রুমানিয়ায় হিজরত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে স্ট্যালিনের বর্বর আক্রমণ ও নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে গ্রীণ পেনিনসুলা ও ক্রিমিয়ার মুসলিম তাতাররাও দলে দলে হিজরত করে রুমানিয়ার দবরুদিয়া প্রদেশে বসতি স্থাপন করে। এখানে উল্লেখ্য যে রুমানিয়ার রাজা প্রথম মিখাইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির পক্ষ নিয়েছিলেন।

রুমানিয় সরকারের দেয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ৮৫টি জাতিসত্তায় বিভক্ত রুমানীয় মুসলিমগণ রাজধানী বুখারেস্ট হতে শুরু করে দবরুদিয়া প্রদেশে রাজধানী কনসটানা হয়ে তুলসী পর্যন্ত দানিয়ুর নদীর কিনার ধরে কৃষ্ণ সাগরের পাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। মুসলিম অধ্যুষিত প্রধান প্রধান নগরগুলো হচ্ছে মানগালিয়া, বাবা ওয়াগা, মাজিদিয়া, টেকীরকোল , ইদী কালা, হামজাজিয়া এবং কনসটানটা। রুমানীয় সরকারের ১৯৩০ সালের পরিসংখ্যানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩,৪৫,৭২০ দেখান হয়।

সরকারী হিসাব মতে রুমানিয়ায় বর্তমানে ৭২টি মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন ইসলামী সেন্টার রয়েছে। ১৮৬১ সালে নির্মিত হোনিকার সেন্টার মসজিদ, ১৫২২ সালে বাবা দাগ নির্মিত বাবদাগ কেন্দ্রীয় মসজিদ, ১৮৭০ সালে কনসটানটা প্রাদেশিক রাজধানীতে নির্মিত আনাদেল কাওয়ী সেনটার মসজিদ এবং ১৫৯০ সালে মানগলিয়া শহরে ইসমাত সুলতান সেন্টার মসজিদ আজও মুসলমানদের স্থাপত্য ও সৌন্দর্যপ্রীতির নিদর্শন হিসেবে বিরাজ করছে। মুসলিমদের প্রতিষ্ঠিত শত শত ইসলামী স্কুল ও মাদ্রাসা কমিউনিস্টরা ১৯৪৭ সালের পর বন্ধ করে দেয়। ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং মুসলিম শিশু ও তরুণদের জন্য মার্কসবাদী স্কুলসমূহে অধ্যয়ন বাধ্য'তামূলক ঘোষিত হয়। সরকার মাজিদিয়া শহরের বিখ্যাত 'ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব মাজিদিয়া' বন্ধ করে দেয়। উল্লেখ্য এখান থেকে ইমাম, মুবাল্লিগগণ ট্রেনিং নিয়ে পুরো বলকান অঞ্চলে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে ছড়িয়ে পড়তেন। কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগেরুমানিয়ার প্রতিটি শহর ও অঞ্চলে মুফতি ও মুহতাসিব নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২৩ সালের রুমানীয় সংবিধান অনুযায়ী মুসলিম মুফতীগণ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট সরকার তা বাতিল করে দেয়। বর্তমানে কনসটানটাইন শহরের দারুল ইফতার প্রধান শেখ ইয়াকুব মুহাম্মদ রুমানিয়ার মুফতি হিসাবে স্বীকৃত।

সরকারও মুসলমানদের স্বীকৃত নেতা হিসেবে তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমান মুফতি ২৩ সদস্যের একটি ইসলামিক কাউন্সিলের সহায়তা লাভ করেন, যারা গোপন ব্যালটে মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

১৯৬৮ সালে গৃহীত সংবিধানের ১৭ এবং ২২ ধারা অনুযায়ী ধর্ম বর্ণ, জাতিসত্তা নির্বিশেষে সকল রুমানীয় নাগরিকের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মুসলমানরা সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত। একজন ইমামের বেতনের ৩ গুণ বেতন খৃষ্টান পাদ্রীর। গীর্জা যে ক্ষমতাভোগ করে মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো তার বিশ ভাগের একভাগ ক্ষমতাও ভোগ করে না। খৃষ্টান মিশনারীগণ ধর্ম প্রচারে বিশেষকরে মুসলিম এলাকাগুলোতে খৃষ্টবাদ প্রচারে সরকারী মদদ পাচ্ছে। মুসলমানদের এই সুযোগ নেই।

সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির পরও রুমানীয় মুসলমানগণ ক্রমান্বয়ে সচেতন ও সংগঠিত হচ্ছে। তারা বর্তমানে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী সুসংগঠিত। সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুসলমানরা বর্তমানে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। বুখারেস্ট মসজিদের ইমাম মাওলানা রাজাব সালেহ সম্প্রতি রাবিতায়ে আলমে ইসলামীর প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে রুমানীয় মুসলমানরা বিশ্ব মুসলিমের সহায়তা চায়। তিনি রুমানীয় হজ্জ যাত্রীদের জন্য রাবিতার আতিথেয়তা ও সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন এবং বুখারেস্টে একটি রাবিতার কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। বর্তমানে রুমানিয়ার দবরুদিয়া প্রদেশের রাজধানী কনসটানটা ও মাজিদিয়া শহরে ইসলামী সেন্টার ও মসজিদ কমপ্লেক্সের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা এই দু'টি প্রকল্পে অর্থ যোগান দিচ্ছেন। প্রকল্প দু'টির কাজ সমাপ্ত হলে রুমানীয় মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদনে তা ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবে নিঃসন্দেহে।

কমিউনিস্ট যাতাকলে ইথিওপিয় মুসলমান

লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরের সংযোগ স্থলভূমিতে অবস্থিত উত্তর পূর্ব আফ্রিকার দেশ ইথিওপিয়া। ১২ লাখ ২১ হাজার ৯০৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দেশ আফ্রিকার দশম বৃহত্তম ভূখন্ড। পূর্বে জিবুতি ও সোমালিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া এবং উত্তর-পশ্চিমে সুদান ঘেরা ইথিওপিয়া। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ৩,৩৯,০৫,৭০০ জন।

লোহিত সাগরের পানি ছোঁয়া ইথিওপিয়া বিচিত্র ভাষাভাষী অধ্যুষিত এক দেশ। আমহারিক, দওমেরো, তিগরে, তিগরিনা, গুরেজ, ইতালী, আরবী এবং ইংরেজী ভাষাগুলো মানুষের মধ্যে প্রচলিত। দেশের জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশ মুসলিম, চল্লিশ শতাংশ খৃষ্টান এবং বাকীরা অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিক। তবে ক্ষমতার দন্ডমুন্ড পরিচালনায় রয়েছে খৃষ্টানরা।

ইথিওপিয়া পূর্ব আফ্রিকার সমাজতান্ত্রিক দেশ আর এই সমাজবাদ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন বর্তমান সরকার লেঃ কর্ণেল মেঙ্গিস্টু হাইলে মরিয়ম। ১৯৭৭ সালে তিনি ক্ষমতা দখল করেন। সম্রাট হাইলে সেলাসী ক্ষমতাচ্যুত হলে তিন বছর পর হাইলে মরিয়ম গদিতে বসেন। ক্ষমতায় আরোহণ করার পর তিনি যে অভিনব পদ্ধতিতে শোষণ, নির্যাতন এবং অত্যাচারের খড়গ পরিচালনা করেন তার ইতিহাস আজ আর কারো অজানা নেই। তার বিচিত্র রাজনৈতিক দর্শনে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এবং জাতীয়তাবাদের এক অদ্ভুত সম্মিলন পরিদৃষ্ট হয়। তবে বিলিয়মান মার্কসবাদের মানসপুত্র হিসেবেই মরিয়ম সমধিক পরিচিত। আদ্দিস আবাবার পথে পথে তাই লেনিন ও স্ট্যালনের মূর্তি এবং কার্ল মার্কসের প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে। মরিয়মের এইসব কীর্তিকলাপের জন্যই তিনি বর্তমান বিশ্বে একজন কট্টর সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত। ফলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় যা স্বাভাবিক তার চেয়ে ভিন্ন কোন চিত্র ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রেও চিন্তা করা যায় না। জোরপূর্বক সমাজতন্ত্রীকরণ, ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিলুপ্তি, মুসলমানদের উপর নির্বিচার আক্রমণ এবং সীমাহীন নির্যাতন ইথিওপিয়ার এক স্বাভাবিক চিত্র। ইথিওপিয়ার মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক সামরিক সরকার তার দেশে ত্রাস সৃষ্টির যে সব নব নব কৌশল অবলম্বন করে যাচ্ছে তার বলি হচ্ছে সেখানকার সংখ্যালঘু ওমেরো মুসলমান।

ইথিওপিয়ায় ইসলামঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই ইথিওপিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ)–এর জামানায় মক্কার কুরাইশদের হাতে অত্যাচারিত মুসলমানরা দু'দফায় ইথিওপিয়া তথা আবিসিনিয়ায় চলে যায় এবং সেখানকার রাজা নাজ্জাসীর আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করে। তখন থেকেই মূলতঃ ইসলাম ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করে। আবিসিনিয়ার রাজবংশের সাথেও মুসলমানদের গড়ে উঠে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। তাই দেখা যায় মুসলিম সাম্রাজ্য এবং সভ্যতার সমৃদ্ধির যুগে সমগ্র উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা জয় করেও মুসলমানরা কোন দিনই ইথিওপিয়া সীমান্তে সমাবেশ ঘটায়নি। তখনকার আবিসিনিয়া অবশ্য বর্তমান ইথিওপিয়ার একটিমাত্র অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সপ্তম শতক হতেই মুসলিম আরবরা আবিসিনিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করতে থাকেন। তাদের সংশ্রবে এসে বিভিন্ন গোত্রগুলোও ইসলাম কবুল করে নেয়। ফলে দশম শতকের দিকে আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শেরখা, আরবাবিনি, হাদিয়া, দারা বালি দুয়ারা ইত্যাদি অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে।

ইথিওপিয়ার মুসলমানদের দুরবস্থাঃ

ইথিওপিয়ার মুসলমানরা নির্যাতিত বহুকাল পূর্ব হতেই। এই নির্যাতন শুরু হয় এগারো শতকের দিকে যা চলেছে অনেকদিন পর্যন্ত, চলছে আজ পর্যন্তও। এগারো শতকে মুসলিম শক্তিগুলো ইউরোপীয় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আবিসিনিয়ার তদানিন্তন শাসকরা মুসলিম রাজ্যগুলোর উপর হামলা চালাতে আরম্ভ করে। কিন্তু পাঁচশ বছর যুদ্ধ চলার পরও কোন পক্ষই চূড়ান্ত জয়লাভে সক্ষম হয়নি। কালক্রমে আবিসিনিয়ার 'গালা' প্রভৃতি প্রধান গোত্রগুলোও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এতে খৃষ্টান শাসকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং উনিশ শতকের নবম দশকে রাজা জোহানেস মুসলিমদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে জোরপূর্বক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে। তার অত্যাচার নিপীড়নের অসহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মুসলমানরা দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাতো শুরু করে। মুসলিম বিশ্বকে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়ার জন্য ব্যগ্র ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজশক্তিগুলো তখন আফ্রিকার একমাত্র খৃষ্টান শক্তি ইথিওপিয়ার সাথে হাত মেলায় এবং মুসলমানদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতনের নীল নকশা রচনা করে।

১৮৮৯ সালের কথা। জোহানসের মৃত্যু হলে দ্বিতীয় মেনেলিক ইথিওপিয়ার রাজা নিযুক্ত হন। মেনেলিক পূর্ব আফ্রিকা জয়ের জন্য ইউরোপীয় মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান

শক্তিগুলোকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। ইউরোপীয়রা ওগাদেন, হারার, আউসা, আরুমি, জিমনা, ওরালে প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যগুলো অধিকার করে নেয়। তারপর শুরু হয় মেনেলিকের মুসলিম নির্যাতন। দেশের সর্বত্র জালিম মেনেলিক অমানুষিক অত্যাচার, লুটতরাজ ও হত্যাকান্ড পরিচালনা করে। বিভিন্ন স্থানে নির্মিত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র ও মাদ্রাসাগুলো আইন করে বন্ধ করে দেয়া হয়, মসজিদগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং আলেম ও জ্ঞানী গুণীজনদের কারাগারে অন্তরীণ করে রাখা হয়। মেনেলিকের পরবর্তী সম্রাট মুসলমানদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিলেন। কিন্তু তার এই দুর্বলতা বা মুসলিম প্রীতি পোপের নিকট সহ্য হলো না। তাই পোপের নির্দেশে ইথিওপিয়ায় সংঘটিত হলো এক সামরিক অভ্যুত্থান। সম্রাট লীজ ইসুকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনী মেনেলিকের কন্যা সাদিতুকে ইথিওপিয়ার সম্রাজ্ঞী নিয়োগ করে। সাউদিতুর সময় আবারো নির্যাতন নেমে আসে মুসলমানদের উপর। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হলে রিজেন্টরাস সেলাসী নাম ধারণ করে ইথিওপিয়ার সিংহাসন দখল করে।

হাইলে সেলাসী পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ছিল বিশ্বস্ত ক্রীড়নক। সে তার রাজ্যের বিভিন্ন পদ এবং পদবী হতে মুসলিম বিতাড়নের কাজ অত্যন্ত শক্ত হাতে সম্পন্ন করে। তার ইসলাম বিদ্বেষ এতটা মারাত্মক ছিল যে হারার, নিসমা, ইকাত ইত্যাদি শহরে ইসলামী তাহজীব তমুদ্দুনের কেন্দ্রগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। মুসলমানদের উপর 'নৈতিক কর' নামে এক অমানবিক কর ধার্য করা হয়। 'শরিয়তী আদালতগুলোকে' বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয় কেউ যদি সরকারের আইনকে ইসলাম বিরোধী বলে যথাযথ পালনে অনীহা প্রকাশ করে তাকে 'রাজশক্তির অবমাননা নিরোধ' অন্যায় আইনের বলে কারাগারে নিক্ষেপ করা হত।

১৯৫৫ সালে ইথিওপিয়ায় সেলাসী সরকার তার শাসনতন্ত্র সংশোধন করে এমন এক শাসননীতির ক্ষমতা অর্জন করে য়াতে তারই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। পাশ্চাত্য মিত্রদের মদদপুষ্ট শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে একচ্ছত্র শাসন পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় হাইলে সেলাসী। ফলে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত বা কোন নীতিকে প্রভাবিত করার সব ধরনের সুযোগ মুসলমানদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে তাই চাপা ক্ষোভ ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হতে থাকে। এই ক্ষোভ কালক্রমে বিদ্রোহের বহ্নিরূপ ধারণ করে। এমনি সময় হাইলে সেলাসীর শাসন ক্ষমতা এক প্রচন্ড হুমকির মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হলে সেলাসী উৎখাত হয় এবং মেজর জেনারেল আম্মান আনভোর

নেতৃত্বে গঠিত হয় নয়া সামরিক সরকার। পরবর্তী নভেম্বরে আনভোর গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে ইথিওপিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। এমন সময় অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক পরিষদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তেকেরী বিনতি, মেজর হাইলে মরিয়ম এবং লেঃ কর্নেল আতনাতু আবেতা। তেকেরীকে চেয়ারম্যান, মরিয়মকে ভাইস চেয়ারম্যান করে পুনর্গঠিত পরিষদ সামরিক শাসন পরিচালনা করতে থাকে। এদিকে ১৯৭৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তেকেরীর পদে অন্তর্বর্তীকালীন সামরিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন হাইলে মরিয়ম। মরিয়ম ক্ষমতায় এসেই দেশে ত্রাস সৃষ্টির এক নতুন অভিযান পরিচালনা করে। দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। মুসলমানদের যে কোন প্রতিবাদ এবং সরকারী নীতির সমালোচনাকে 'লাল সন্ত্রাসের' মাধ্যমে কঠোর ভাবে দমন করার পথ বেছে নেয় মার্কসবাদী হাইলে মরিয়ম।

১৯৭৮ সালের একটি ঘটনা। আদ্দিস আবাবার নিউমার্কেট এলাকার একটি মসজিদে ধর্মীয় বক্তৃতা শোনার জন্য প্রায় শ'খানেক লোক একত্রিত হয়। মরিয়ম সরকারের বর্বর বাহিনী বিনা উস্কানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই সব নিরপরাধ শ্রোতাদের উপর। সৈন্যরা সোজাসুজি মসজিদে ঢুকে পড়ে এবং বেপরোয়াভাবে মুসল্লীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এতে বিশজন মুসল্লী নিহত হয় এবং বাকীদের প্রায় সবাই আহত হয়। সরকার জামে মসজিদের ইমাম সাহেবের দুই পুত্রকে খুন করে কোন কারণ ছাড়াই। মরিয়ম সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিপীড়ন এবং নির্যাতন এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, প্রায় প্রতিনিয়তই মুসলমানদের লাশ ইথিওপিয়ার রাস্তা অথবা উম্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

১৯৮৫ সালের কথা। ইরিত্রিয়া, টাইগ্রে, ওরোসিয়া এবং ওগাদেন ইত্যাদি স্থানগুলোতে ইথিওপিয় বাহিনী মুসলিম বিদ্রোহ দমনের নামে অবিরাম গুলি বর্ষণ করে। সামরিক জান্তার হামলায় এই সব এলাকাগুলো জনমানবশূন্য মরুএলাকার রূপ ধারণ করে। পূর্ব ইথিওপিয়ার বড় এলাকা হারারজিতে ঐ বছরই প্রচন্ড ধরনের হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করা হয়। গারা মালটা, চারচর এবং গুরজামের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতে গুলি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অগণিত মুসলমান। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে আনিয়া শহরে এগার জন প্রখ্যাত আলেমসহ একশ জনের বেশী মুসলমানকে হত্যা করে মরিয়ম সরকারের বর্বর বাহিনী। তাদের মধ্যে দু'জন প্রখ্যাত আলেম হচ্ছেন শেখ হাসান আদম এবং শেখ ইউসুফ আলী। ওদিকে '৮৫-এর জানুয়ারী মাসেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে শিল্প নগরী ডায়ার ডাওরার বিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছোট্ট শহর ভাংগাগুতে। সেখানে ষাটজন

মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাবলি, বিফতু এবং শারীক খালিদ শহরের একশ সাতচল্লিশজন লোককেও হত্যা করে মেঙ্গিষ্টু সরকারের লেলিয়ে দেয়া বর্বর বাহিনী। '৮৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কুরকাতে পনের এবং ওয়াটারে চব্বিশ জনকে খুন করা হয় নির্বিচারভাবে। তাছাড়াও যে কত খুন ও গুমের অনেক অজানা তথ্য রয়ে গেছে দৃষ্টির অন্তরালে তার ইয়ত্তা নেই।

ইথিওপিয়া খরা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশ। বিগত বছরগুলোতে খরার প্রচন্ড কষাঘাত সেখানকার বহু জীবনের অবসান ঘটায়। তবে এ ক্ষেত্রেও মুসলিম জনগণের মৃত্যুর সংখ্যাই বেশী। খরা বা দুর্ভিক্ষ পীড়িত মুসলিম অঞ্চলে সরকার পরিকল্পিতভাবেই খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ বন্ধ করে রাখায় এর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়। ১৯৮৪ সালের ঘটনা। প্রচন্ড খরায় মুসলিম এলাকাগুলো প্রায় বিরানভূমিতে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা প্রায় দিশেহারা। কিন্তু সরকার কোন খাদ্য সামগ্রী সেখানে না পৌছানোর কারণে বহু জীবনের অবসান ঘটে সেদিন। অথচ এখানকার পীড়িত মানুষের জন্য প্রচুর খাদ্য বস্তু পাঠানো হয়েছিল দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে। ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনালের মতে, 'মুসলিম এলাকাগুলোতে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ। বিদেশ হতে এদের জন্য এসেছে প্রচুর খাদ্য এবং চিকিৎসা সামগ্রী। হাজার হাজার টন খাদ্য সামগ্রী ইথিওপিয়ার বন্দরগুলোতে গচ্ছিত। কিন্তু তা দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় পৌছেনি। ফলে হাজার হাজার মানুষ খাদ্যাভাবে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এদিকে মজুদ কেন্দ্রগুলোতে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী পচে যাচ্ছে। অথচ তা মুসলিম এলাকাগুলোতে পৌছানো হচ্ছে না।'

ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনালের এই বিবরণ হতেও মুসলমানদের করুণ চিত্রটি ফুটে উঠে সুন্দরভাবে। সত্যিকার অর্থে ইথিওপিয়ার কম্যুনিস্ট সরকার মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্মূল করার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন বরাবর। কেননা কমুজিমের দুর্বল কাঠামো এবং মরিচিকার জন্য ইসলাম এবং মুসলিম এ দু'টো জিনিস হচ্ছে ভয়ংকর। ইসলামের শাশ্বত ও কালজয়ী আদর্শের নিকট সমাজতন্ত্রের ভেলকিবাজি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় কম্যুনিস্ট সরকারগুলোর মধ্যে বরাবরই লক্ষ্য করা যায়। তাই সমাজতান্ত্রিক নিষ্পেষণ এবং একনায়কতন্ত্র চালানোর স্বার্থেই এইসব সরকার মুসলিম জনগণের উপস্থিতিকে বরদাস্ত করতে পারে না। ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

দক্ষিন ইয়েমেনে মুসলিম নির্যাতন

দক্ষিন ইয়েমেন। বর্তমানে ইয়েমেন জনগনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানী এডেন। দক্ষিন পশ্চিম এশিয়ার তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে দেশটির অবস্থান ১৯৮৩ সালের হিসেব অনুযায়ী দক্ষিন ইয়েমেনের জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ সাত হাজার। এর অধিকাংশই আরব। তাছাড়াও ভারতীয়, সোমালী এবং ইউরোপীয়দের ও কিছু লোক এখানে বসবাস করে আসছে।

১৮৮২ সাল হতে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৫ বছর দক্ষিণ ইয়েমেন ছিল বৃটিশ আশ্রিত উপনিবেশ। বৃটিশরা ১৭৯৯ সালে পেরিম দ্বীপ, ১৮৩৯ সালে এডেন বন্দর এবং ১৮৫৪ সালে কুলিয়া মুরিয়া দ্বীপ দখল করে নেয়। পরে ১৯৬৭ সালের ২৩শে নভেম্বর এই দ্বীপগুলোকে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে বৃটিশরা প্রতিশ্রুতি দেয়ার সাথে সাথে এই এলাকায় শুরু হয় ক্ষমতার লড়াই। ক্ষমতার লড়াই–এ একদিকে ছিল জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট আর অন্যদিকে ছিল মিশর সমর্থিত ফ্লোসী (front for the liberation of south yemen)। ১৯৬৬–৬৭ সালের দিকে দুই গেরিলা ফ্রন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চরম আকার ধারন করে। এদের মধ্যে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট ছিল বেশ শক্তিশালী। গৃহযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বৃটিশ ফেডারেশনের সেনাবাহিনী এসে যোগদান করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্টে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে বৃটেন মুক্তিফ্রন্টের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হয়। ঐ বছর ৩০ শে ডিসেম্বর দক্ষিন ইয়েমেন স্বাধীনতা ঘোষনা করে। স্বাধীন দক্ষিন ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন কাহতান মোহাম্মদ আশ শাহাবী। স্বাধীন ইয়েমেনে দেখা দেয় তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। ফলে দলের বামপন্থী কর্মীরা মুক্তিফ্রন্ট নেতা প্রেসিডেন্ট আশশাহাবীর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। দেশে শুরু হয় চরম গোলযোগ। এই গোলযোগপূর্ন পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সনের ২২শে জুন বামপন্থী মুক্তিফ্রন্ট সদস্যরা সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট আশশাহাবীকে পদচ্যুত ও বন্দী করে এবং গেরিলা নেতা রুবাইয়া আলীকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। রুবাইয়া আলী চরম বামপন্থী বিধায় তিনি ক্ষমতায় এসে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঘোষনা দেন এবং সকল বিদেশী কল–কারখানা এবং ব্যবসা বানিজ্য রাষ্ট্রয়াত্ত করেন। ১৯৭০ সালে দেশে এর সংবিধান জারী করা হয় এবং এই সংবিধানেই দেশের নাম রাখা হয় "ইয়েমেনের জনগনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।"; দেশে চালু হয় একদলীয় শাসন।

রুবাইয়া আলী প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ১৯৭১ সালে বামপন্থী দলের সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন মস্কোপন্থী ব্যক্তিত্ব আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল। ইসমাইল কট্টর মার্কসবাদী ও মস্কোপন্থী। আর রুবাইয়া আলী ছিলেন চীনপন্থী এবং উদারনৈতিক। তাই রুবাইয়া আলীর সাথে সরকারী দলের সেক্রেটারী জেনারেল ইসমাইলের বিরোধ শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা চরম আকার ধারন করে।

১৯৭৮ সাল। গুলী বিদ্ধ হয়ে নিহত হন প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী। অনেকের ধারনা এই হত্যাকান্ডে ইসমাইলের হাত ছিল সক্রিয়। রুবাইয়া আলী নিহত হলে ক্ষমতায় এলেন নাসের মুহাম্মদ। কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যেই নাসের পদচ্যুত হন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইল। ইসমাইলের প্রেসিডেন্ট পদ লাভের সাথে সাথে দক্ষিন ইয়েমেনে রাশিয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তি পূর্নতা লাভ করে এবং ইয়েমেন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে।

দক্ষিন ইয়েমেনে সমাজতন্দ্র যতই পাকাপোক্ত হতে থাকে সেখানকার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার ততটা তীব্রতা ধারন করতে শুরু করে। স্বাধীনতার পর হতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ইয়েমেনের মুসলমানরা বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার। কারন সমাজতন্ত্রে প্রথম শিকারই হচ্ছে ধর্মপ্রান মুসলমান। সমাজতান্ত্রিক যাঁতাকলে নিপিষ্ট আফগান এবং সিরিয়ার মুসলমানদের নির্যাতনের খবর পৃথিবীর মানুষ জানতে পারলেও দক্ষিন ইয়েমেনের নিপীড়িত মুসলমানদের নির্যাতনের খবর অনেকেই জানতে পারে না।

পঞ্চাশের দশকে মিসর এবং সুদানে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হলে তখনই তা পার্শ্ববর্তী দেশ ইয়েমেনে ছড়িয়ে পড়ে। লাল হাতূড়ী এবং কাস্তের কমিউনিজম দক্ষিন ইয়েমেনে শুধু মাথা উচুঁ করেই দাঁড়ায়নি বরং তা অফিস আদালত এবং মসজিদগুলোতেও পর্যন্ত প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ইযেমেনের মসজিদ গুলোও বর্তমানে সমাজতন্ত্রী ক্যাডারদের প্রশিক্ষনকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষিন ইয়েমেনের রাজধানী এডেনে "সেন্ট্রাল ইসলামিক ইন্সটিটিউট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যা ইসলামী শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাত। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তা বামপন্তী নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দফতরে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং বুদ্ধি জীবীদেরকে কমিউনিষ্ট সরকারের হাতে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। এককালের জ্ঞান-গরিমার শহর টেইমের তিনশত পঁয়ষট্টির মত মসজিদকে জোর পূর্বক ইমামবিহীন করে রাখা হয়েছে। টেইম, এডেন, ওয়াদীডাউন, আলওয়াহদী এবং বিহানের একশ 'জন শ্রেষ্ঠ আলেমকে বামপন্থীরা বর্বর নির্যাতন চালিয়ে মেরে

ফেলে। ইমামদের গাড়ীর পেছনে বেঁধে গাড়ী চালিয়ে দেয়া হয়েছে যতক্ষন না এরা মৃত্যুবরন করেছে। কিন্তু এইসব নৃসংশ নির্যাতনের করুন চিত্র নাস্তিক্যবাদী ইয়েমেনের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে বাইরের জগতে প্রকাশিত হতে পারেনি। যারা দুর্বিসহ অবস্থা হতে কোন রকমে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তাদের মুখ হতেই কমিউনিষ্ট নির্যাতনের এসব তথ্য জানতে পারা যায়। পালিয়ে আসা মুসলমানদের একজনের বক্তব্য হচ্ছে, "সেখানে তাদের সামনেই দু'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। নাবিল মুরশিদ নামে একজন যুবককে মেরে তার ঘরের সামনে ফেলে রাখা হয়। দেশের ছেলেমেয়েদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজতন্ত্র শিক্ষাদান করা হয়।''

বিশ্বের আর্ন্তজাতিক সংস্থা, সংবাদ মাধ্যম এবং মানব কল্যানে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কাছে দেয়া দক্ষিন ইয়েমেনের "কংগ্রেস অব দি পেট্রিয়াটিক ফোরসেস" –এর একটি চিঠির জবাব হচ্ছে, "দক্ষিন ইয়েমেনের জনগন একটি স্বৈরাচারী দলের কঠোর মতবাদের জালে আটকা পড়ে আছে এবং ইস্পাত নির্মিত এক পুরো দেয়ালে তাদের জীবন বন্দী হয়ে পড়েছে।"

দক্ষিন ইয়েমেন সরকার মুসলমানদের হজব্রত পালনের উপরও কঠোর নিয়ন্ত্রন চালু রেখেছে। যদিও আদ্দিস আবাবা, কিউবা কিংবা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে ইয়েমেনী মুসলমানরা ভ্রমন করার অনুমতি পাচ্ছে সহজেই। সরকার এক হাজার পাঁচশ' ইয়েমেনীকে প্রতি বছর ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের নাম দিয়ে সমাজতন্ত্র শিক্ষাদানের জন্য কিউবায় প্রেরন করে থাকে। এদেরকে দুই থেকে চার বছর পর্যন্ত সেখানে রেখে মুলতঃ পাকা নাস্তিক বানানো হয়।

দক্ষিন ইয়েমেন একটি মুসলিম প্রধান গরীব দেশ। জনগন অল্পসংখ্যক মরু এবং পর্বতময় জমির মালিক। দেশের অর্থনীতি উন্নত না হলেও কৌশলগত দিক থেকে দেশটির অবস্থান গুরুত্বপূর্ন। কারণ ইয়েমেনকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলে ভারত মহাসাগর এবং লোহিত সাগরের জলভাগ নিয়ন্ত্রন করা খুবই সহজ ব্যাপার। আর এটা হচ্ছে আর্ন্তজাতিক ব্যবসা–বানিজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ন পথ। তাই দক্ষিন ইয়েমেনের উপর খবরদারী করার আকাংখা জেগেছে পরাশক্তি গুলোর বিশেষ করে রাশিয়া এবং আমেরিকার। শক্তির দাপটে অবশেষে রাশিয়াই জিতেছে এবং ইয়েমেনকে তার হুকুম পালনের মত পুতুল রাষ্ট্রে পরিনত করতে পেরেছে।

বর্তমানে দক্ষিন ইয়েমেনের কম করে হলেও রাশিয়ার তিন হাজার বিশেষজ্ঞ এবং দুই হাজার নাগরিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদে নিযুক্ত আছে। ইয়েমেনে সাকাটরাতে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে এবং রাজধানী এডেন ও বিরাছিম দ্বীপে ও সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে সাতাশ

হাজার সৈন্য, পনের হাজার মিলিশিয়া এবং তিন হাজার পুলিশকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

দক্ষিন ইয়েমেনে রাশিয়ার এই অভূতপূর্ব উপস্থিতি থেকে এটাই মনে হয় যে, ইয়েমেন কিছু সংখ্যক এজেন্টের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার দ্বারাই শাসিত হচ্ছে। "ইয়েমেন সোসালিস্ট পার্টি" ব্যতীত ইয়েমেনে অন্য কোন রাজনৈতিক দল নেই। আর এই সমাজতান্ত্রিক দলের স্বৈর শাসনের যাঁতাকলে মুসলমানরা চরমভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে দেশকে চরম নৈরাজ্যের শিকারে পরিনত করা হয়েছে। কিন্তু জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরনের দিকে সরকারের কোনই লক্ষ্য নেই। বরং মার্ক্সীয় শাসক গোষ্ঠি সামরিক সরঞ্জাম আমদানী করে উত্তরোত্তর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ পাকাপোক্ত করার স্বপ্নে বিভোর হয়েরয়েছে।

হাঙ্গেরীতে ইসলাম

হাঙ্গেরী পূর্ব মধ্য ইউরোপের একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। সোভিয়েত জোটভূক্ত ক্ষুদ্র এ দেশটির আয়তন ৯৩,০৩০ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৮০ সালের হিসেব অনুযায়ী সে দেশের জনসংখ্যা ছিল ১,০৭,০৯,৫৩৬ জন। বর্তমানে যা প্রায় এক কোটির মত। জনগনের মধ্যে আছে খৃষ্টান, মুসলমান এবং ইহুদী। জাতি সত্তার দিক থেকে ৯০% হাঙ্গেরীয়ান বংশোদ্ভুত, বাকিদের মধ্যে হাঙ্গেরীয় স্লাভ ০·৬% শ্লোভাক ১·১%, দক্ষিনাঞ্চলীয় স্লাভ ০·৩%, রুমানীয় ০·২% এবং ৬% হাঙ্গেরীয় যাযবর।

হাঙ্গেরীর অর্থনীতি শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক। প্রধান ফসল ধান, ইক্ষু, বীট, গম, আলু, বার্লি, যব এবং দ্রাক্ষা। দেশটিতে আছে উর্বর সমভূমি। মদ উৎপাদনে হাঙ্গেরী বিখ্যাত। দেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হচ্ছে যন্ত্রপাতি, খাদ্য দ্রব্য, জ্বালানী এবংভোগ্যদ্রব্য।

বর্তমানে দেশটিতে চলছে একদলীয় স্বৈরশাসন। ক্ষমতাসীন দলের নাম হাঙ্গেরীয়ান ওয়াকার্স পার্টি। ১৯৪৫ সনে রুশপন্থী কমিউনিষ্টরা জোর করে দেশটির ক্ষমতাদখল করে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরীতে রুশবিরোধী বিপ্লব শুরু হলে সোভিয়েত শাসকরা কঠোরনীতি অবলম্বন করে এবং রাশিয়া দুই লাখ লালবাহিনী ও আড়াই হাজার ট্যাংকসহ দেশটিতে হামলা চালায়। ফাঁসি দেয়া হয় উদার নৈতিক প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাগী এবং কর্নেল পল মলিতকে। হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এবং জেলে বন্দী করা হয় অগনিত মানুষ। আর দেশ ছেঁড়ে পালিয়ে যায় প্রায় দু'লাখ হাঙ্গেরীয়ান।

কিন্তু বর্তমানে হাঙ্গেরীর সেই কঠোর সমাজতন্ত্রী নীতির শাসন আর নেই। ৩২ বছর পর ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে হাঙ্গেরীর লৌহমানব জুনাস কাদারকে। গনতন্ত্রী মানুষের ক্রমাগত চাপে দেশটিতে লৌহ শাসনের ছিড় ধরেছে। ৪০ বছর বয়স্ক প্রধান মন্ত্রী মিকলস নেমেযা দেশে গনতন্ত্র দানের কথা ঘোষনা দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই সেখানে গঠিত হয়েছে নতুন রাজনৈতিক দল "ডেমোক্রেটিক ফোরাম"। ছাত্ররা ও গড়ে তুলছে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন। ক্ষমতাশীল পলিটবুরোর সদস্য সুজোরস বলেছেন, "বর্তমান কাঠামোতে সমাজতন্ত্র তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পুর্নবিবেচনা প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের দিন এখন শেষ

এবং এখন তা সকল উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক।" হাঙ্গেরীর বিচারমন্ত্রী বলেছেন "আমার লক্ষ্য হচ্ছে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন করা।"

হাঙ্গেরীর নতুন প্রধানমন্ত্রী এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "গনতন্ত্রের পক্ষে মানুষ যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাচ্ছে তা থেকে ফিরে আসা যাবেনা, কিন্তু রাতারাতি সত্যিকার গনগন্ত্র প্রতিষ্টাও সম্ভব নয়।" তিনি আরো বলেন, "হাঙ্গেরীর মানুষকে মানবিক অধিকার দিতে হবে।" অর্থাৎ বর্তমান হাঙ্গেরী সমাজতন্ত্রের ঘোর তন্দ্রা থেকে যে মুক্তির পথে এগুচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

হাঙ্গেরীর রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। যুগে যুগে এদেশ বিজয়ীর হাতে পড়েছে। যতদূর জানা যায় খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালের দিকে হাঙ্গেরী রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। রোমানরা হাঙ্গেরীকে তাদের প্যানোনিয়া ও দ্যাসিয়ার প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। ইসলামী শক্তি কর্তৃক বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হওয়া শুরু হলে হাঙ্গেরীতেও সাম্রাজ্যবাদী শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। এসময় হাঙ্গেরীতে ইসলামের আহবানও এসে পৌছে। অষ্টম শতাব্দী হতে এয়োদশ শতাব্দীকালে হাঙ্গেরীতে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য অবস্থানে উন্নীত হয়। এর কারণ ছিল ত্রিবিধ। ১· নিম্ন ভলগা উপত্যকায় বসবাসরত তুর্কী উপজাতীয় সংস্পর্শে এসে বহু হাঙ্গেরীয় ইসলাম কবুল করে ২· তুর্কী ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের দ্বীনী তৎপরতার ফলশ্রুতিতে নবম শতাব্দীর শুরুতে দানিয়ুব নদী অববাহিকায় বহু যাযাবর ও বেদুইন দ্বীন কবুল করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে ৩· ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের অগ্রাভিযানের ফলশ্রুতিতে বহু মুসলমান হাঙ্গেরীতে চলে আসে। ঐতিহাসিক ইয়াকুত হামাভী তার গ্রন্থ মুজআম আল বুলদানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ১২২৮ সালে আলেপ্পোতে একদল হাঙ্গেরীয় মুসলিম ছাত্রের সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং হাঙ্গেরীতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে বলে তাদের কাছে জেনেছেন। এ সময় হাঙ্গেরীতে 'ত্রিশটিরও বেশী ইসলামী গ্রাম ছিল। স্পেন থেকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত ইমাম ও মুবাল্লিগ আবু হামিদ মুহাম্মাদ আল ঘরনীতে তার বিখ্যাত গ্রন্থ তুহফাত আল আলবাদ ওয়ানুকবাত আল আদবে হাঙ্গেরীতে এ সময়কার দওয়াতী তৎপরতার এক অনবদ্য চিত্র অংকন করেছেন। ১৫২৬ সালে উত্তর ও পশ্চিম হাঙ্গেরী ছাড়া সমগ্র হাঙ্গেরী তুর্কী শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়। ইউরোপীয় সম্রাটগণের আত্ম বৈরিতার সুযোগে তুর্কীরা হাঙ্গেরী দখল করে। হাঙ্গেরী আক্রমণ করার জন্য ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস তুর্কী সুলতান সুলাইমানকে পরামর্শ দেন এবং সুযোগ বুঝে তুর্কীবাহিনী হাঙ্গেরী আক্রমণ করে। মহাকাশের যুদ্ধে হাঙ্গেরীয়গণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং হাঙ্গেরীয়রাজা দ্বিতীয় লুই প্রাণ। ১৬৯৯ সাল পর্যন্ত হাঙ্গেরীতে

মুসলিম শাসন অব্যাহত থাকে। তুর্কী শাসনামলে হাঙ্গেরীতে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যায়। উত্তর হাঙ্গেরী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়। এসময় বঙ্গ মসজিদ ও ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় হাঙ্গেরীতে মুসলিম প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ মুহাম্মদ বিন নাসির আল আবুদী বলেন, Muslim population in Hungary amounted to hundreds of thousands during Ottoman rule. Hundreds of Mosques & Islamic Schools were established.

অটোমান শাসনের সময় হাঙ্গেরীতে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। তখন হাঙ্গেরীতে ৮৩টি মসজিদ ছিল এবং ১০টি ইসলামী স্কুল বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন অনেক ইসলামী পাঠাগার ও সেখানে গড়ে উঠে। কিন্তু বর্তমানে হাঙ্গেরীতে এইসব প্রতিষ্ঠানের কোনটাই বর্তমান নেই। কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম হবার পর হতে মুসলমানদের উপর শুধু নির্যাতনই নেমে আসেনি তাদের ইসলামী ঐতিহ্য পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়। রাজধানী বুদাপেষ্টে শেখ গুল বাবার সমৃতিস্তম্ভ ছাড়া আর কোন মুসলিম নিদর্শন বাকী নেই। তারপর মুসলমানদের নগন্য স্মৃতিস্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় কেন্দাস, ইজার, হামজারে, সেলকস এবং সিজদাইভ প্রভৃতি গ্রামে। অটোমান শাসনের আমলে হাঙ্গেরীর মুসলমানরা দুবার বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। প্রথম তারা বিপর্যস্থ হয় ১৩০৮ সাল হতে ১৩৪২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। তারপর অটোমানের পর যখন প্রিন্স হাবসবার্গ ক্ষমতা দখল করেন তখন ও মুসলমানরা নির্যাতিত হন। সেই সময় হাজার হাজার লোক নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

১৯৮৫ সালের ১৯শে জুলাই হতে ১১ই আগস্ট একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল হাঙ্গেরীসহ পূর্ব ইউরোপ সফর করেন। তারা শেখ বাবার সমৃতি স্তম্ভের গেইটে বসা একজন লোককে দেখে প্রশ্ন করেন যে এখানে কোথায় কোথায় মুসলমান আছে। লোকটি উত্তর দিলেন এই বলে There are no Hungarian Muslims any more" (অর্থাৎ আর কোন হাঙ্গেরীয়ান মুসলমান নেই)

তুর্কীদের হাঙ্গেরী হতে চলে যাবার পর হাঙ্গেরীর মুসলমানরা নির্যাতনের মুখে হয় নিহত হয়েছে অথবা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে আত্ম রক্ষা করেছে। রাশিয়ায় রুশ বিপ্লবের পর মুসলমান জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য যেভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয় ঠিক তেমনি ভাবে হাঙ্গেরীর মুসলিম জনগনকে রুশ কায়দায় খতম করতে দ্বিধা করেনি রাশিয়ার দখলদার সেনারা। কেননা সমাজতন্ত্রের মত অমানবিক এবং বাকরুদ্ধকর মতবাদ মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার

পথে ইসলাম এবং মুসলমানরাই যে একমাত্র বাধা তা ছিল রুশদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ঠ। তাই আজও দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধেই সমাজতন্ত্রীদের একমাত্র বিষোদগার প্রয়োগ হচ্ছে। পেকস–এ বসবাসরত লোকটি প্রতিনিধিদলকে আরো জানায়, তারই এলাকায় একসময় তিনটি মসজিদ ছিল যার একটিকে গীর্জা, দ্বিতীয়টিকে যাদুঘর এবং তৃতীয়টিকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হয়।

প্রতিনিধিদল বুদাপেষ্টে অবস্থিত মিসর দুতাবাসে গমন করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে হাঙ্গেরীর মুসলমানদের সর্ম্পকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। সেখানে মিসরীয় কোন মুসলমান নেই এবং কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও নেই। দূতাবাসের লোকজন নিজস্ব ভবনেই জুমার নামাযের ব্যবস্থা করে থাকেন। তবে প্রতিনিধি দলের রিপোর্ট হচ্ছে সেখানে ভ্রমনের জন্য অথবা লেখাপড়া করার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে আগত কিছু মুসলিম যুবক আছে যাদের অধিকাংশই এসেছে আলজিরিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন অথরা উপসাগরীয় এলাকা গুলো হতে। প্রতিনিধিদলটি পরে হাঙ্গেরীর দক্ষিন অঞ্চলীয় শহর পেকস–এ গমন করেন সেখানে কোন মুসলমান আছে কিনা জানার জন্য। তারা সেখানে সাজী কাসিম পাশা মসজিদটি খুজেঁ পান যেটিকে গীর্যায় রূপান্তরিত করা হযেছে। তারা ইয়াকুব আলী হাসান মসজিদটির সন্ধান পান। এটিকে যাদুঘরে পরিনতকরা হয়। আর একটি মসজিদ ছিল যেটিকে ভেংগে ফেলা হয়েছে এবং সেখানে ইদ্রিস বাবা নামক শুদু একটি স্তম্ভমাত্র রাখা হয়েছে। প্রতিনিধি দলের লোকজন খোঁজ করেও শহরে কোন মুসলমানের সন্ধান পাননি। তারা একজন পাকিস্তানী নাগরিক ডঃ আবদুল মুনিম খানের সাথে দেখা করেন। জনাব মুনিম মেডিসেনের একজন পোষ্ট গ্রাজুয়েট। তিনি বুদাপেষ্টে একটি ইসলামী কেন্দ্র নির্মান করার জন্য "রাবেতা আলমে আল ইসলামী"–এর নিকট আবেদন করেছিলেন। প্রতিনিধি দলের সদসারা ডঃ মুনিমকে তার প্রকল্প এবং হাঙ্গেরীর মুসলমানদের অবস্থা সর্ম্পকে প্রশ্ন করেন। তিনি যে জবাব দেন তা এরূপঃ I had searched for Hungarian Muslims but found none. After with draw of the Turks, Hungarian muslims had been found to embrace charistainity. Those who remained had in course of time and under persistant persecution dewindled away or might have concealed their faith in fear of their lives." অর্থাৎ তিনি হাঙ্গেরীতে খুঁজে কোন মুসলমান পাননি। তূর্কীরা চলে যাবার পর

মুসলমানদের জোর করে খৃষ্টানে দীক্ষিত করা হয় আর যারা খৃষ্টান হয়নি সময়ের স্রোতে তারাও এক সময় তাদের বিশ্বাস হতে দূরে সরে পড়ে। কারন মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকাটা ছিল জীবনের জন্য মারাত্মক হুমকী স্বরূপ। ইসলামী কেন্দ্র সর্ম্পকে ডঃ মুনিম বলেন তিনি এমন একটা স্থান খুঁজে যাচ্ছেন যেখানে কিছু মুসলমান অন্ততঃ একত্রিত হতে পারবে। তিনি বলেন, হাঙ্গেরীর প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ এখনও গীর্জায় গমন করে। তারা রবিবারে গীর্জায় সাপ্তাহিক আরাধনায় মিলিত হয়। তার প্রকল্প সম্পর্কে তিনি বলেন, রাবেতার সাহায্য সর্ম্পকে তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছেন।

প্রতিনিধিদল একজন মহিলার সাথে সাক্ষাত করেন। নিসেস আবদুল করিম গারমানস নাম্মী এই মহিলার বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি বলেন, হাঙ্গেরীর মুসলমানদের সর্ম্পকে তিনি সামান্য মাত্র জানেন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই অধিকাংশ মুসলমান নিহত হয় বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন তার স্বামী মুসলমানদের সম্পর্কে অনেক লিখেছেন। ১৯৭৯ সালে তার স্বামী মারা যায়। কিন্তু বহু কষ্টে তার জানযার ব্যবস্থা করা হয় এবং একটি খৃষ্টান গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সরকার তার স্বামীর সকল বই পুস্তক বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

হাঙ্গেরী এককালে আযানের ধ্বনিতে ছিল মুখরিত। কিনতু আজ আর তার অস্তিত্ব নেই। কমিউনিষ্ট নির্যাতন এবং খৃষ্টান ষড়যন্ত্রের মুখে মুসলমানদের অস্তিত্বই আজ বিলীন হয়ে গেছে। তবে যে অল্প সংখ্যক মুসলমান আজ হাঙ্গেরীতে বসবাস করছে তাদের চেষ্টায় হয়তো বা একদিন সেখানে দীনের আলো জ্বলে উঠবে। কমিউনিষ্ট শাসনের যে শিথীলতা এখন চোখে পড়ছে এরকম সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া ও যায় না।

চীনে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা

এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীন। জনসংখ্যার দিক থেকে দেশটির অবস্থান পৃথিবীর শীর্ষে। তেতাল্লিশ লাখ বর্গমাইলের দেশ চীনের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় তিরাশি কোটি। এই জনসংখ্যার শতকরা এগারজন মাত্র মুসলমান। চীনের সব কটি অঞ্চর জুড়ে কিছু না কিছু মুসলমান থাকলেও সিনকিয়াং, কানসু, নিয়াংসিয়া, হুই, ইউনান, জেচওয়ান, হুপেই, হেনান, শার্নাস এবং শাটাং প্রদেশেই মুসলমানরা অধিক সংখ্যায বসবাস করে। কখন কিভাবে মুসলমানরা প্রথমে চীন দেশে বসবাস শুরু করে তার কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি আজও। চীনা এবং মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সূত্র হতে চীনে মুসলিম ইতিহাসের একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা হতে জানা যায় হিজরী প্রথম শতকেই চীন দেশে ইসলামের আলো বিচ্ছুরিত হয়। কেউ কেউ বলেন, রসূল (সাঃ)–এর জীবদ্দশায় তাঁরই উদ্যোগে চীনে ইসলাম প্রচারিত হয়। তাদের মতে, মহানবী (সাঃ) ৬২৭ খৃষ্টাব্দে কায়েস, সাদ এবং কাসেম–এই তিনজন সাহাবী নিয়ে একটি কাফেলা চীনের রাজা তাউসৃংয়ের কাছে পাঠান। এই সূত্রের বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে জানা যায় সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কুয়াংচুতে অবস্থান করেন এবং তারই উদ্যোগেহাওয়াই সাং মসজিদ নির্মিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রাঃ) ৬৫১ খৃঃ চীনের প্রাচীন রাজধানী শিয়ানে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাদের মতে এই প্রতিনিধি দলের মাধ্যমেই চীন ইসলামের আলো লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগের গ্রন্থরাজি হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং ইঙ্গিত হতে জানা যায় ৭১৫ খৃঃ চীনে মুসলমানদের পদচারণা প্রথম শুরু হয়। তখন তুর্কীস্থানের কাশগড় জয়ের জন্য মুসলমান সেনাপতি কুতাইবা যুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি বিজয় লাভেও সমর্থ হন। এই বিজয়ই নাকি চীনাদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যোগসূত্র রচনা করে। তবে এইসব মতামতকে চীনে মুসলিম ইতিহাসের যথার্থ প্রমাণ বলে ধরে না নিলেও ছয় থেকে সাত'শ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় চীনে ইসলামের আলো অনুপ্রবেশ করেছিল এমন একটা ধারণা করা বোধ হয় ভুল হবে না।

এইসব তথ্য ছাড়াও পশ্চিমা পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী থেকেও চীনের মুসলমানদের সম্পর্কে একটা অনুমান করা যায়। সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে জেসুয়েট সম্প্রদায়ের পাদ্রী এবং মিশনারীরা চীনের মুসলমান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে তাদের দেয়া বর্ণনা হতে তেমন কোন সময় এবং সংখ্যাতত্ত্ব জানা সম্ভব হয়নি। চীনের মুসলমান সম্পর্কে ইবনে বতুতার বর্ণনা হতেও ছিটেফোঁটা কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা চীনদেশে ভ্রমণ করেন। চীনে ভ্রমণের সময় তিনি বহু মুসলমানের সাথে পরিচিত হন। চীনের মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেন, "চীনের মুসলমানরা খুবই ভদ্র এবং অমায়িক।" তার বর্ণনা হতে জানা যায় চীনে প্রত্যেক শহরের একটি এলাকা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে মুসলমানদের মসজিদ বিদ্যমান। সে সব মসজিদে মুসলমানরা ইবাদত করতেও তিনি দেখেন। ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীর বর্ণনা হতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে চীনে বহু পূর্ব হতেই বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং ইসলাম চীনের ধর্মীয় ইতিহাসে তার একটা শক্ত ভিত্তি রচনায় সক্ষম হয়েছিল।

চীন দেশে যখন যেভাবেই ইসলাম প্রবেশ করুক না কেন, তা দু'টি পথেই আসার সুযোগ হয়েছিল। চীনের দক্ষিণ অঞ্চলে স্থলপথে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে জলপথে। ইসলামী রাষ্ট্র এবং সভ্যতার স্বর্ণযুগের সূচনালগ্ন হতেই বিশ্বের সমুদ্রগুলোতে আরবের সামুদ্রিক সওদাগরী জাহাজ ভেসে বেড়াত। তাদের মাধ্যমে এভাবে পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল, ঠিক তেমনি চীনের মূল ভূখন্ডেও ইসলামের বিকাশ সাধিত হয়। চীনের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম ব্যবসায়ী এবং পর্যটক ও প্রচারকদল ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ইসলামও প্রসার লাভে সমর্থ হয়।

চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে মধ্য এশিয়ার প্রচারকদের ভূমিকা খুবই লক্ষ্যণীয়। সেই সময় চীন সম্রাট এবং মুসলিম খেলাফতের মধ্যে সম্পর্ক ছিল উন্নত। চীন সম্রাট এবং খেলাফতের পরিচালক এবং খলিফাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে শাহ ইরান ইবাজদ গার্দের সময়। ইবাজদ গার্দের মৃত্যু হলে তার পুত্র ফিরোজ শাহ ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু তিনি প্রচুর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে উঠেন। এমতাবস্থায় শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য ফিরোজ শাহ চীন সম্রাটের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু চীন ইরান হতে বেশ দূরে হওয়ায় সম্রাট হযরত ওসমান (রাঃ)–কে ফিরোজ শাহের জন্য সুপারিশ করেন। চীনা দূত হযরত ওসমান (রাঃ)–এর দরবারে এলে খুবই

সম্মানিত হন। খলীফা চীনা দূতের প্রত্যাবর্তনের সময় তার সাথে একজন আরবী সিপাহসালারকে প্রেরণ করেন। চীনা সম্রাটও এই আরবদেশী মেহমানকে খুবই কদর করেন। ফলে চীনে মুসলমানদের যাতায়াত এবং প্রভাব বিস্তারের একটা সুযোগ রচিত হয়।

এদিকে খলিফা অলীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় (৭৫৫–৭৯৫ খৃঃ) কোতাইবা ইবনে মোসলেম খোরাসানের শাসক নিযুক্ত হন। কোতাইবা জাইলুন সাগর অতিক্রম করে রক্তাক্ত যুদ্ধের পর মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরকন্দ এবং অন্যান্য স্থান জয় করেন। এইসব এলাকায় তিনি ইসলামী শাসন কায়েম করেন। রাশিয়ার এইসব এলাকা বিজয়ের পর কোতাইবা চীন অভিযানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সৈন্যরা পূর্ব চীনের সীমানায় এগিয়ে আসে। এদিকে কোতাইবা একজন মুসলিম দূতকে চীন সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাট তাকে প্রচুর অর্থ–সম্পদ দিয়ে বিদায় করেন। খলিফা হেশামের রাজত্বকালে (৭২৪–৭৪৩ খৃঃ) চীনের সাথে বাগদাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন ব্যবসা–বাণিজ্যেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এই সময় দলে দলে ইসলাম প্রচারক দল চীন দেশে আসতে থাকে। তারা যেহেতু দ্বীন প্রচারের জন্য খুব উদগ্রীব ছিল ফলে তাদের নিরলস চেষ্টায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। সে সময়কার একজন চীনা ঐতিহাসিক (৭১৩–৭৪২ খৃঃ) ইসলামের ব্যাপক প্রসারের কথা উল্লেখ করে লিখেছেনঃ “আমাদের দেশ হতে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত পশ্চিমারা সয়লাবের ন্যায় এদেশে আসতে থাকে। তারা এসে নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ আমাদের মহামান্য সম্রাটের নিকট পেশ করে। আর আমাদের সম্রাট তা সম্মানের সাথে গ্রহণকরেন।”

মোঙ্গলদের বিজয়ের প্রাক্কালে (১২৭৭–১৩৬৭ খৃঃ) চীনে মুসলমানদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। তখন সিরিয়া, আরব, ইরান ও তুর্কী মুসলমান পরিবার হিজরত করে চীনের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপন করে। তাদের আগমনের কারণ ছিল ব্যবসা অথবা চাকুরী। তাছাড়া কিছু কিছু মুসলমান যুদ্ধবন্দী হিসেবেও চীনে আগমন করে। দীর্ঘদিন ধরে চীনে অবস্থানের ফলে ঐসব মুসলমানদের সাথে চীনা মেয়েদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে মুসলমানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় মুসলমানরা চীন সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। ১২৪৪ সালে আবদুর রহমান নামে একজন ব্যক্তি চীন সরকারের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং তার উপর রাষ্ট্রের যাবতীয় কর আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়েও চীনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী দায়িত্ব পালন করেছিল। কুবলা খানের (১২১৫–১২৯৪) সময়ে

চীনের মুসলমানদের ছিল স্বর্ণযুগ। তখন চীনের মুসলমানদের কয়েকজন মন্ত্রীও ছিল। শুধু তাই নয়,চীনা সামরিক বাহিনীর বেশ ক'টি গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল সেখানকার মুসলমানদের হাতে।

ইয়েনের রাজত্বকালে (১২৭৯–১৩৬৮) চীনা সমাজ বিনির্মাণে মুসলমানরা কার্যকর ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছিল। চীনের ব্যবসা–বানিজ্যেও মুসলমানরা খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'ফন লিয়েন' নামক একজন মুসলমান চীনের অন্যতম ধনীদের একজন ছিলেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানও কম নয়। মুসলমানদের একজন নামকরা চীনা বিজ্ঞানী ছিলেন "তাকহা মা লিউ তিং।" তিনি "wan Ninenli" নামক একটি ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন। এই ক্যালেন্ডারটি ১২৮১ সালে চীনের অফিস পঞ্জিকা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল।

কিন্তু মোঙ্গলদের রাজত্বের শেষ পর্যায়ে মুসলমানরা তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, মিং এবং কিং–এই দুই সরকারের (১৩৬৮–১৯১১) সময় মুসলমানরা চরম নির্যাতনেরও শিকার হয়েছিল। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিদ্রোহ পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়। মুসলমানদের এই বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ আন্দোলন মাওসেতুংয়ের চীন বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে। সাম্প্রতিককালের চীনে ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ায় সেখানকার মুসলমানদের জন্যও বেশ সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। দেং ঝিয়াও পেং–এর নমনীয়তা বর্তমান চীনকে নতুন পথে পরিচালিত করায় মুসলমানরাও কিছুটা ধর্মীয় স্বাধীনতা ফিরে পাচ্ছে। মুসলমানদের জেগে উঠার সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত চীনা "পিপলস ডেইলী" পত্রিকার রিপোর্ট থেকে জানা যায়, চীনা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এখন বেশ সুযোগ–সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গির সুযোগে চীনের অতীত মুসলিম সংস্থাগুলো পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে বলেও পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়। ১৯৮০ সালে ইসলামী সংস্থার পুনর্গঠনের পর সরকারও এর প্রতি নজর দিতে শুরু করেন। সরকারের পক্ষ হতে চীনের দু'হাজার আটশ ইমামকে বর্তমানে বেতন দেয়া হচ্ছে। ১৯৮০–৮৩ সালে ইমামদের বেতন বাবদ তিন লাখ ইয়েন অর্থ সরকার বরাদ্দ করেন। তাছাড়া দু'লাখ ইসলামী বই, আট হাজার কপি কোরআনও ছাপা হয় ১৯৮৩ সালে। বর্তমানে চীনের মুসলমানরা সমাজতন্ত্রী কারাগার হতে যে সামান্য সুযোগ–সুবিধায় ফিরে আসতে পারছে তার প্রমাণ মেলে মুসলমানদের হজব্রত পালনের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৪ সালের ১৭ই নবেম্বর সংখ্যায় "Beijing

Review" -তে হাজীদের সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়- "Some 1,000 Muslims would travel to makkah that Autuman, consisting the largest Pilgrimage since thefounding of the new china in 1949. Prior to the Pilgrimage organised by the chinese Islamic Association, it was reported that a delegation of 48 members including imams, mullahs and islamic scolars and led by "fas khan Xianxi, vice president of the Association went Mokkah in late August."

চীনা শামনতন্ত্রের ৪৬ নং ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। উক্ত ধারাটিতে বর্ণিত আছে, দেশবাসী যে কোন ধর্মে বিশ্বাস, অবিশ্বাস কিংবা নাস্তিকতার স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু মাও সমাজতন্ত্রের অষ্টোপাশে মুসলমানরা এই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। ধর্ম পালনের যাবতীয় উপায়-উপকরণ সরকারী দমননীতির বেড়াজালে ছিল বন্দী। বর্তমানে চীন যেভাবে উদারনীতির দিকে অগ্রসর হচেছ তাতে আশা করা যায় বহির্বিশ্বের মুসলমানদের সাথে চীনাদের সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেতে পারবে। এতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হবে, বৃদ্ধি পাবে জ্ঞান আহরণের প্রেরণাও। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (সঃ)-এর সেই বিখ্যাত হাদীস-"প্রয়োজনে জ্ঞান অর্জনের জন্য চীন দেশেও যাও"-এই চেতনায় বলীয়ান মুসলিম উম্মাহ চীনের দিকে সোনালী প্রভাতের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্রত্যয়ে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েআছে।

আলজেরিয়ায় বিপন্ন মুসলমান

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দেশ আলজিরিয়া। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ এবং পর্বত ও মরুভূমিবহুল এই দেশটি আয়তনে ৯,১৯,৬০০ বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ২ কোটি ৬১ লক্ষ। আলজিরিয়ার শতকরা ৯২ জন লোকই আরবী ভাষাভাষী মুসলমান। ১৮৩০ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আলজিরিয়া ফরাসী উপনিবেশের অধীন ছিল। দীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলনের পর ফরাসী নাগপাশ হতে ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই দেশটি স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়। কিন্তু এর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে আলজিরিয়ার বহু সংগ্রামী মুসলমানকে। ১৯৪৫ সালে ফরাসী বাহিনীর হাতে ৪৫,০০০ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে প্রাণ দিতে হয়েছে। পরে সংগ্রামী নেতা, স্বাধীনাতা আন্দোলনের অগ্রদূত আহমদ বেনবেল্লার নেতৃত্বে প্রচন্ড স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় এবং তারই নেতৃত্বে প্রায় দশ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের রক্তের বিনিময়ে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা বেনবেল্লা বেশী দিন ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। ১৯৬৫ সালের জুন মাসে তাকে গদিচ্যূত হতে হয়। কর্ণেল বুমেদীন ক্ষমতায় আসেন। বুমেদীনের মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন চাদলী বেনজাদিদ। বুমেদীনের শাসনামলে আলজিরিয়ায় নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয় এবং এক গণভোটের মাধ্যমে তা জনগনের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে আলজিরিয়ায় কায়েম রাখা হয়েছে একদলীয় স্বৈরশাসন। জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট নামের এই দলের মাধ্যমেই দেশটির শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। যদিও দেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত, কিন্তু বাস্তবপক্ষে রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আলজিরিয়ায বরাবরই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ চালু রয়েছে এবং এর আলোকেই রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডল সাজানো হয়েছে। কিন্তু এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সমাজ চেতনা এবং জনসাধারণের মন–মানসিকতার সাথে একাত্ম হতে পারেনি। সমাজতন্ত্র আলজিরিয়ার ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পারেনি। দীর্ঘদিন পর হলেও বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ আলজিরিয়ার সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতাকে ব্যর্থ বলেই মানে করছেন। প্রেসিডেন্ট চাদলী বেনজাদীদের "মার্ক্সের রাষ্ট্রীয় সনদ" পুনর্বিবেচনা করা এবং আরবীয়করনের ব্যাপক প্রস্তুতি সরকারের শুভ মনোভাবের ইঙ্গিতই বহন

করে। বাইশ বছরের অনিশ্চয়তা এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব পরিহার করে আরবীয়করনের এই সিদ্ধান্ত ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে শুরু হয়।

কিন্তু যারা ফরাসী চিন্তাধারায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাদের যুক্তি হচ্ছে আলজিরিয়ার জনগণ আরবীয় নয়, বরং মূলত তারা বারবারিয়ান। আরবী হচ্ছে উন্নতমানের বিদেশী ভাষা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে জনপ্রিয় ভাষা হিসাবে সেই ভাষাটির উন্নয়ন প্রয়োজন যা আরবী এবং ফরাসীর সংমিশ্রণ। জাতীয় ভাষায় বারবার ভাষাকে অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারেও তারা দাবী জানিয়েছেন। বারবার জনগণের সাথে একাত্ম। এই অংশটির অবস্থান ইসলামের মুখোমুখি কতটুকু তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। কারণ বারবারদের ভাষাও কিন্তু মূলতঃ আরবী। আরবীদের বিরুদ্ধে আর অন্য যে একটি দল আছে, তাদের বক্তব্য হচ্ছে আরবী একটি অচল ভাষা এবং বিজ্ঞানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাদের এই ঝোঁক প্রবণতা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় বিশ্বের চিন্তা–ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে আরবীয় চিন্তাধারা প্রভাবিত অংশের যুক্তি হচ্ছে আরবী আলজিরিয়ার ব্যক্তিত্ব এবং সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আরবী ইসলাম ধর্মের ভাষা। আর ইসলাম আলজিরিয়ার ৯৮ শতাংশ মুসলমানের পবিত্র ধর্ম।

সব ধরনের বাধা এবং সমস্যা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা ক্ষেত্রে আরবীর প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্তরের দশকে তা আরও অধিক বৃদ্ধি পায় এবং আশির দশকে এসে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হয়। বর্তমানে আলজিরিয়ার ৬০ শতাংশ যুবক আরবীতেই লেখাপড়া করে থাকে। কিন্তু আরবীর ব্যাপারে যে স্থায়ী বাধা তা শিক্ষাক্ষেত্রে নয় বরং অন্যত্র জড়িত। প্রশাসন, পাবলিক সার্ভিস এবং জাতীয় কোম্পানীগুলো হাজার হাজার ডিগ্রীধারীকে বেকার করেছে। শিক্ষায় আরবীয় এই ঝোঁক প্রবণতা অনুসরণ করতে তারা রাজী নয়। তাই আরবীকে সাধারণ যোগ্য করার জন্যই বর্তমানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ফরাসী সংস্কৃতির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আলজিরিয়ানদের মন থেকে আরবীকে বাদ দেয়া সম্ভব নয় এই কারণে যে, আরবীকে ইসলাম থেকে পৃথক রাখার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষাকে আরবীকরণ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে চেতনাবোধ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষ তা চাননি। দেরীতে হলেও বর্তমানে ইসলামী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে এই আরবীকরণের ফলেই। আর তার ফলেই মুসলিম সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজতন্ত্র যে অপর্যাপ্ত, তা জনসাধারণ বুঝে উঠতে পেরেছে। প্রেসিডেন্ট চাদলী বেনজাদীদের মতে, আলজিরিয়া একটি আদর্শিক পরিবর্তনের কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে।

ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট চাদলী জনসংগঠনগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং এফ, এন, এন দলের (ক্ষমতাসীন দল) কেন্দ্রীয় সদস্যদের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সেখানে তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোন সরাসরি বক্তব্য রাখেননি। বরং আরব ইসলামী সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত একটি সমাজ পরিগঠনের ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জোর দেন। শিক্ষায় মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি চারটি অনুচ্ছেদে আরব–ইসলাম এবং আলজিরীয় সভ্যতার পরম্পরা বিচার করার কথা বলেন।

চাদলী বেনজাদীদ বলেন, জাতীয় সংবিধানের উন্নয়ন সাধনের জন্য উহাকে জনগণের কাছে পুনরায় মতামত পেশের জন্য পাঠানো যেতে পারে। এই সংবিধান মার্কসীয় একটি দলিল, যা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করতো। ১৯৭৬ সালে এই সংবিধান একটা মুখোশপরা জনভোটের ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়েছিল। চাদলী বেনজাদীদ বলেছিলেন সংবিধানের পর্যালোচনা মৌলিক অধিকারে কোন প্রভাব ফেলবে না।

প্রকৃতপক্ষে সংবিধানে পরিবর্তনের পরিকল্পনা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। আলজিরিয়ার সরকার বা কর্তৃপক্ষ দুটি জিনিস বুঝতে পেরেছেন। এর একটি হলো এই যে আধুনিক মুসলিম সমাজের জন্য স্পষ্টতঃই ইসলামের উত্থান একটি চরম বাস্তবতা। তিউনিসিয়াতে ইসলামী আন্দোলনের স্বীকৃতি আলজিরিয়ার কর্তৃপক্ষকে নতুন সমাজ চেতনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে আগ্রহান্বিত করে তুলেছে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

বর্তমান অবস্থার উত্তরণের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বা পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্র হতে দূরে সরে যাওয়ারই নামান্তর মাত্র। ১৯৭৯ সালে চাদলী বেনজাদীদ ক্ষমতায় আসার পর হতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তিনি সর্বদাই বিকেন্দ্রীকরেণর পথে অগ্রসর হয়েছেন। বর্তমান এই নতুন কৌশল পশ্চিমা বিশ্ব দ্বারা প্রভাবিত এবং তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠতে থাকে এই বছরে রাজধানী ওয়াশিংটন ভ্রমণ করে আসার পর হতে। আলজিরিয়া সরকারের বর্তমান পরিগঠন পরিকল্পনা মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অতীতের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হতেই সঞ্চিত।

আলবেনিয়ার মুসলমান

বিশ্বের মানচিত্রে আয়তনে খুবই ছোট একটি দেশ আলবেনিয়া। আড্রিয়াটিক সাগরের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ইউরোপের একমাত্র মুসলিম প্রধান দেশ আলবেনিয়ার আয়তন ১১ হাজার ১০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মুসলিম, ২০ ভাগ গ্রীক অর্থডক্স খৃষ্টান ও ১০ ভাগ রোমান ক্যাথলিক। জাতিসত্তার দিক থেকে ৯৯% আলবেনিয়ান, বাকীরা তুর্কী, স্লাভ ও সার্ব বংশোদ্ভূত। আলবেনিয়ার উত্তর ও পূর্বে যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণে গ্রীস এবং পশ্চিমে আড্রিয়াটিক সাগর অবস্থিত। জনসংখ্যা ৩ লাখ। শিক্ষিতের হার ৭৫%। শহরবাসী শতকরা ৩৮ ভাগ। রাজধানী তিরানা। ভাষা আলবেনিয়ান ও গ্রীক। মুদ্রা লেক আলবেনিয়া ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ওয়ারশ সামরিক জোটের সদস্য ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬ শতাংশ। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে আলবেনিয়ার জন্মহার সর্বাধিক। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১৭০.২৭ জন।

আলবেনিয়ায় একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতাসীন দলের নাম আলবেনিয়ান কমিউনিস্ট ওয়ার্কাস পার্টি। বর্তমানে পার্টির প্রধান হচ্ছেন রমিজ আলী। তিনিই এখন রাষ্ট্রের দন্ড মুন্ডের কর্তা। ১৯৮৫ সালে আনোয়ার হোজ্জার (কমিউনিস্ট নাম এনভার হোজ্জা) মৃত্যুর পর তিনি ক্ষমতায় আসেন। ১৯৪৪ সালে হোজ্জার নেতৃত্বে রুশ ও যুগোশ্লাভিয়াপন্থী কমিউনিস্টরা একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করে। আলবেনিয়া স্টালিনপন্থী দেশে পরিণত হয়। দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা গণভোটে নির্বাচিত জাতীয় এসেম্বলীর উপর ন্যস্ত। মন্ত্রী পরিষদ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন এবং একই সাথে জাতীয় এসেম্বলীর নেতৃত্বাধীন।

আলবেনিয়ার অর্থনীতি শিল্প ও কৃষিভিত্তিক। তবে কৃষি ও শিল্পে দেশটি ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনো পিছিয়ে রয়েছে। গবাদি পশুপালন এবং দেশের মধ্যাংশস্থিত উপত্যকা ভূমিতে কর্ন গম, ভুট্টা, তামাক, রাই, বার্লি, যব, বিট, আক, তামাল, জলপাই, অম্ল জাতীয় ফল প্রভৃতির চাষ এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। প্রধান শিল্প রাসায়নিক সার, বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ক্যাবল, সিমেন্ট ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি। খনিজ সম্পদের

মধ্যে কয়লা, ক্রোমিয়াম, তামা, বিটুমিন, লৌহ, পেট্রোলিয়াম, এসফল্ট, বক্সাইট, লিগনাইট, পাইরাইটস প্রধান। আলবেনিয়ার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হচ্ছে জ্বালানী তৈল, ধাতব দ্রব্য (মোট রপ্তানীর ৬৩%), কাঠ, পশম ইত্যাদি। আমদানীর মধ্যেপ্রধানহচ্ছেখাদ্যশস্য।

আলবেনিয়া ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। তিরানার মূল বাণিজ্য এমনকি রাজনৈতিক সম্পর্কও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে। এমনকি আলবেনিয়ার সর্বশেষ সংবিধান অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে ঋণ নেয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কমরেড হোজ্জা। বিদেশী নির্ভরতা কমিয়ে আনার ওপর হোজ্জা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেভাবেই গড়ে তুলেছেন আলবেনিয়ার অর্থনীতি, কিন্তু এতকিছু করেও খুব একটা ভাল ফল হয়নি। কেননা আজও আলবেনিয়াকে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ যুগোশ্লাবিয়ার যেখানে জাতীয় উৎপাদন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭·৭ বিলিয়ন ডলারে সেখানে আলবেনিয়ার জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ১·২ বিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু আয় এখানে ৫২০ ডলার (যুগোশ্লাভিয়াতে ১৭৫২ ডলার)। আমদানীর পরিমাণ যেখানে ১৫৯ মিলিয়ন ডলার সেখানে রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ৯১ মিলিয়ন ডলার। চার দশক যাবত বিশ্বের অপরাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে আলবেনিয়ার ৩০ লাখ অধিবাসী একটি জটিল ব্যবস্থায় বসবাস করছে এবং তারা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে চলেছে। এ জীবন ব্যবস্থায় আশু পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। আলবেনিয়াতে ব্যক্তিগত মালিকাণাধীন গাড়ী নেই। যেহেতু আলবেনিয়া ইউরোপের সবচেয়ে অনুন্নত দেশ সেহেতু এর জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে মাথাপিছু আয় হিসেবে আলবেনিয়াকে ইউরোপের সর্বনিম্নতম দেশ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

বলকান রাষ্ট্রমন্ডলীর অন্তর্গত আলবেনিয়ার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান (Geo-Political Location) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইউরোপ থেকে ভূমধ্যগসাগরের দিকে এখান দিয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে আলবেনিয়ার সামুদ্রিক বন্দর ভ্যালোনা ও সাসেনো পালন করতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ১৯৬১ সালে মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর থেকেই এ দু'টি বন্দরের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এমনকি ক্রেমলিনের সামরিক নেতৃবৃন্দ গত ২৮ বছরেও ভ্যালোনার কোন বিকল্প বের করতে পারেনি এ অঞ্চলে। অথচ তার প্রয়োজন আড্রিয়াটিক সাগরঘেঁষা আলবেনিয়ার সামুদ্রিক বন্দরগুলোর সুযোগ সুবিধা। শুধু তাই নয়, জাহাজ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও

নৌবাহিনীর সহযোগী শক্তি হিসেবে বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্যও প্রয়োজন রয়েছে আলবেনিয়ার সামুদ্রিক বন্দরের। বলকানে পোস্ট ব্যবহারের ব্যর্থতা পরিণামে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনেকাংশে দুর্বল করেছে এ অঞ্চলে।

আলবেনিয়ায় আজও আদর্শের লড়াইটাই বড়। এ আদর্শের লড়াই শুরু হয়েছে বলকান অঞ্চলে ক্রেমলিনের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, আর শেষ হয়েছে চীনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। এ আদর্শের লড়াই আলবেনিয়াকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে বহির্বিশ্ব থেকে। স্টালিনপন্থী তিরানা নেতৃত্ব ক্রুশেচভ, ব্রেজনেভ, আন্দ্রোপভ, চেরনেনকো, গরবাচেভসহ ক্রেমলিনের নেতৃত্বকে সংশোধনবাদী বলে চিহ্নিত করে আসছে। কমিউনিস্ট বিশ্বে একসময় আলবেনিয়ার একমাত্র মিত্র ছিল চীন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে দীর্ঘদিন আলবেনিয়ার অবস্থান ছিল ইউরোপে চীনের বন্ধু হিসেবে। এমনকি জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আলবেনিয়া ছিল জাতিসংঘে চীনের মুখপাত্র। সত্তরের দশকের শেষ দিকে সেই মধুর সম্পর্কেও চির ধরে। আলবেনিয়ার কমিউনিস্ট ওয়াকার্স পার্টি প্রকাশ্যেই মাওসেতুং এর ত্রিভুবন তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধিতা করে তার কট্টর সমালোচকে পরিণত হয়। সে থেকে আজ অবধি চীনা নেতৃত্বের পরিবর্তন হলেও তিরানা–বেইজিং সম্পর্ক আর উন্নত হয়নি। আলবেনিয়া স্পেন, ইটালি, ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরেক ধারা ইউরোকমিউনিজমের আচরণ বাচনের সাথেও একমত নয়। তিরানা নেতৃত্ব এদেরকে চিহ্নিত করেন বুর্জোয়া হিসেবে। এটাই আলবেনিয়ার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। আলবেনিয়া মনে করে শুধু সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিই নয়, চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও মার্কসীয় লেলিনীয় আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। আলবেনিয়া মনে করে কেবল মাত্র আলবেনিয়ান কমিউনিস্ট ওয়াকার্স পার্টিই হচ্ছে মার্কসবাদী লেনিনবাদী আদর্শে পরিচালিত সঠিক পার্টি।

আলবেনিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস ও ইসলাম

আলবেনিয়ার রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস। যুগে যুগে এদেশ বিজয়ীর হাতে পড়েছে। আলবেনিয়ার দীর্ঘ ইতিহাস মূলতঃ পরাধীনতারই ইতিহাস। যতদূর জানা যায় খৃষ্টপূর্ব ১০০ সালের দিকে আলবেনিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর আলবেনিয়া বাইজানটাইন সাম্রাজ্যভূক্ত হয়। ইসলামী শক্তি কর্তৃক বাইজানটাইন সাম্রাজ্য ছিন্নছিন্ন হওয়া শুরু হলে আলবেনিয়াতেও সাম্রাজ্যবাদী শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। এসময় আলবেনিয়ায় ইসলামের আহবান এসে পৌছে। অষ্টম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দীকাল আলবেনিয়াতে

মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য অবস্থানে উন্নীত হয়। এর কারণ ছিল বহুবিধ, যেমন (১) বাইজানটাইন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শিথিলতা এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে বাইজানটাইনীদের মুসলিম শক্তির হাতে পরাজয় (২) মুসলিম মুবাল্লিগদের দাওয়াতী তৎপরতা (৩) আড্রিয়াটিক সাগরের উপর মুসরিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও উপকূল ভাগে বসবাসকারী আলবেনিয়ার কৃষিজীবী ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাঝে নৌ-যোদ্ধাদের দাওয়াতী কাজ এবং (৪) আলবেনিয়ার রাজনীতিতে তুর্কীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১৪৫১-৮১) কর্তৃক কনস্টানটিনোপল বিজয়ের ফলে আড্রিয়াটিক সাগর ও ভূমধ্যসাগরের উপর মুসলিম প্রাধান্য কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে আলবেনিয়ার সাথে তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পুরো আলবেনিয়া তখন মুসলিম বাণিজ্য বলয়ে এসে যায়। এসময়ে আলবেনিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি সুদৃঢ় ভিত্তি অর্জন করে। সেকান্দর বক্স দীর্ঘদিন আলজিরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইস্কান্দার বেগ ক্ষমতায় আসেন। ১৪৪৩-৬৮ সাল অবধি আলবেনিয়া স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কনস্টানটিনোপলের পতনের পর দ্বিতীয় মুহাম্মাদ আলবেনিয়ায় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। আলবেনিয়ার মুসলিম নেতা ইস্কান্দার বেগ তুর্কী বাহিনীর কাছে পরাজিত হলে ১৪৬৮ সালে পুরো আলবেনিয়া উসমানীয় তুর্কী শাসনভুক্ত হয়। সে থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত আলবেনিয়া উসমানীয় তুর্কীদের শাসনাধীনে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ে আলবেনিয়ায় গড়ে উঠে ইসলামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য মসজিদ ও মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম জনগোষ্ঠীর যে প্রাধান্য এ সময়ে নিশ্চিত হয় তা আজও আছে আর এজন্য আলবেনিয়া আজও ইউরোপের একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। ১৯১২ সালে সংঘটিত প্রথম বলকান যুদ্ধের রেশ ধরে একই সালের ২৮শে নভেম্বর আলবেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ইতালী, গ্রীস, ফ্রান্স, সার্বিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং বুলগেরীয়ার সৈন্যগণ বিভিন্ন সময়ে আলবেনিয়া দখল করে। ইতালী ১৯২০ সালে আলবেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ১৯২০ সালে এদেশ লীগ অব নেশনস এর সদস্য পদও লাভ করে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি বিভিন্ন সময়ে ইতালী, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এখানে রাজত্ব করেছে। মুসোলিনী আলবেনিয়া দখল করেন ১৯৪৩ সালে ইতালী আলবেনিয়া থেকে চলে আসলে জার্মানী আলবেনিয়া দখল করে। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে জার্মানীকেও চলে যেতে হয়। বস্তুতঃ জার্মানীর বিদায়ের সাথে সাথে আলবেনিয়ান ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট এর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় আলবেনিয়ার সর্বত্র এবং ফ্রন্ট ক্ষমতা

দখল করে ২৯ নভেম্বর ১৯৪৪ সালে। কিন্তু কমিউনিস্টরা তাদের চিরাচরিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতায় আসেন আনোয়ার হোজ্জা। এ সময় আলবেনিয়া ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল থাবায় ক্ষতবিক্ষত হৃতসর্বস্ব একটি দেশ। আনোয়ার হোজ্জা পরিকল্পিত নীতি দিয়ে আলবেনিয়ার উন্নয়নের সূচনা করেন। কিন্তু তত্ব ও আদর্শগত দ্বন্দ্বে আলবেনীয়রা হয়ে পড়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। কমিউনিস্ট আলবেনিয়া ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। হোজ্জা সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের অনুকরণে ও স্বয়ম্ভরতার নীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন এককেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন অর্থনীত। বিদেশী ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৮৫ সালে হোজ্জা মারা গেলে ক্ষমতায় আসেন রমিজ আলী। তিনি ক্ষমতায় এসে নিজস্ব পছন্দমাফিক কিছু পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছেন। তবে দু'পরাশক্তি রুশ ও মার্কিনীদের সাথে সম্পর্ক এখনও এড়িয়ে চলছে আলবেনিয়া। প্রধান প্রধান কমিউনিস্ট দেশে যখন সংস্কারের ঢেউ দ্রুত আছড়ে পড়ছে সে সময় আলবেনিয়ার আড্রিয়াটিক সাগর কূলে সোভিয়েত স্টাইলের পেরেস্ত্রয়কার ছোঁয়া লাগার জন্য বিশ্বকে হয়ত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। আলবেনীয় সরকারের পত্রিকা সোভিয়েত নেতা গরবাচভের নীতির সমালোচনা করে বলেছে, এ নীতি হচ্ছে লেনিন ও অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষার উপর সংশোধনবাদের সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।

রমিজ আলিয়ার জন্য এখন এক কঠিন দিন অতিবাহিত হচ্ছে। তাঁর ক্ষমতা দখলের পর দেশের মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। আলিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো দেশের যুব সমাজের ব্যাপক হারে মার্কসবাদ এবং লেনিনবাদ হতে দূরে সরে যাওয়ার হিড়িক। যুব সমাজ এখন আলবেনিয়ার মার্কসবাদী জীবন দর্শনে অনেক অসঙ্গতি দেখতে পাচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে এ মতবাদটি চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় নতুন কিছু খুঁজে পেতে যুব সমাজ এখন ব্যস্ত। কিছুদিন পূর্বে চীন এবং রাশিয়ান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের যে উথান দেখা দেয় তার ঢেউ আলবেনিয়ায়ও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এদিকে ১৯৭৬ সালে মিঃ হোজ্জা ধর্মকে নির্মূল, বিশেষ করে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার যে সিদ্ধান্ত জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার ক্ষোভ এবং চাপা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এখন ঘটছে। আলবেনিয়ার সরকারী সূত্রে প্রকাশ, দেশের ধর্মীয় গোষ্ঠি এখন পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে আন্দোলনের যে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে তা আলবেনিয়া মুসলমানদের গায়ে গিয়েও ধাক্কা দিচ্ছে।

হোজ্জার আমলে ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা থাকলেও মানুষের মন থেকে ইসলামের অনুভূতি ও বিশ্বাস উপড়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। তওহীদে বিশ্বাসী মুসলমানরা আল্লাহর দেয়া দ্বীন ইসলামকে ঠিকই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। আলবেনিয়ার প্রতিটি জেলায় এখনও ইসলাম প্রিয় লোকজনের সাক্ষাত মেলে। গ্রাম ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে আজও ইসলামের প্রাধান্যই বেশী। হোজা সরকারের আমল হতে আলবেনিয়া এক কঠিন অর্থনৈতিক পীড়নের শিকার। আলিয়া রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় খাদ্য, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, তেল ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বনির্ভবতা ফিরিয়ে আনলেও অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটেনি এখনও। এদিকে ১৯৮৮ সালের পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাও অর্জিত হয়নি। আলিয়া আভাস দিয়েছেন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। একথা সত্য যে আলবেনিয়ার অর্থনৈতিকে দাঁড় করাতে হলে পশ্চিমা জগতের প্রযুক্তি আমদানী করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এটা বুঝেই হয়তো আলিয়া মুক্ত বিশ্বের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ছেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমা জগতের সাথে তিনি কূটনৈতিক সম্পর্কও বৃদ্ধি করেছেন। আলিয়া তাঁর দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন তাতে মনে হয় তিনি আলবেনিয়ার জন্য একটা সংস্কারের প্রত্যাশী। তিনি দেশের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্যই এসব সংস্কার করতে যাবেন।

আলিয়ার ধরণ প্রকৃতিতে শিথিলতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও ধর্মীয় ব্যাপারে নমনীয়তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৪৬ সালে হোজ্জা আলবেনিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দিয়ে নিজে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিদেশ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তগত করার পর ইসলাম এবং খৃষ্টবাদ–এ দু'টো ধর্মের ইবাদত খানাগুলোকে হয় তিনি ভেঙ্গে দেন অথবা বন্ধ করে রাখেন। দাঁড়িওয়ালা যে কাউকেই গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। এমনকি বাইরে থেকে আলবেনিয়ায় শশ্রুমন্ডিত কোন পর্যটক এলে বিমান বন্দরে তাকে আটক করা হয় এবং দাঁড়ি না কাটা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে ঢোকার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। আল–কুরআনসহ সব ক'টি ধর্ম পুস্তক বাতিল ঘোষণা করা হয়। মুসলিম মহিলাদের ইসলামী পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। রাজধানী তিরানাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে পর্দাহীন মহিলাদের বাধ্যতামূলক কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করেন আনোয়ার হোজা। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের শুকরের মাংস ভক্ষণেও বাধ্য করা হয়। হোজার এসব বর্বরোচিত কর্মকান্ডের দোসর ছিলেন বর্তমান শাসক রমিজ আলিয়া। রমিজ দেশে সংস্কার পরিকল্পনায় হাত দিলেও মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে কতটা

বিবেচনা করবেন তা বলা মুশকিল। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে আলিয়া কোন নমনীয় মনোভাব পোষণ করবেন না। হোজার উত্তরসূরী হিসেবে তাঁর পথ হতে দূরে সরে যাওয়া আলিয়ার জন্য কঠিনই বটে। ফলে আলবেনিয়ার মুসলমানদের দুঃখ–দুর্দশার কোন নিরসন আপাততঃ হচ্ছে না।

বার্মায় অসহায় মুসলিম

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কট্টর সমাজতান্ত্রিক দেশ বার্মা। ২,৬১,৭৮৯ বর্গমাইলের এই দেশটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত। বাংলাদেশের সাথে বার্মার ১৭১ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত বিস্তৃত রয়েছে। বার্মা ও বাংলাদেশের মাঝামাঝি পর্বত সঙ্কুল আরাকান প্রদেশ যার অধিকাংশ জনগণই মুসলিম।

প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশ বার্মা। আরাকান প্রদেশের জনসংখ্যার মধ্যে দু'ধরনের ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে। এর মধ্যে যারা রোহিঙ্গা তাদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম অন্য শ্রেণীর মস জাতীয় মানুষেরা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পুরো বার্মায় মোট ছয় মিলিয়ন মুসলমানের বাস। এর ২·৫ মিলিয়নই হচ্ছে আরাকান মুসলিম।

বার্মা ভূখন্ডের সাথে একত্রিত হবার পূর্ব পর্যন্ত আরাকান ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বহু শতাব্দী পর্যন্ত দেশটি স্বাধীন থাকার পর ১৭৮৪ সালে তা বার্মার সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়। তার প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পর ১৮২৩-২৪ সালে এংলো বার্মা যুদ্ধের সময় দেশটি বৃটিশের হাতে চলে যায়। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত আরাকান বৃটেনের করায়ত্ব থাকে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা অর্জনের সময় হতেই আরাকান মুসলমানদের উপর নেমে আসে ঘোরতর দুর্দিন। জুলুম এবং সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হতে থাকে রোহিঙ্গা মুসলমানরা। ঘরবাড়ী হতে উৎখাত ছাড়াও বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম অধিকার হতে বঞ্চিত হয় সেখানকার নিরাপরাধ মুসলিম। ফলে মাতৃভূমিতেই বার্মার মুসলমানরা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

মুসলমানদের প্রতি বার্মা সরকারের বৈরী মনোভাব বহু পূর্ব হতেই। ১৯৩৮ সালে বার্মা কর্তৃপক্ষ তার জুলুমবাজ চরিত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটায়। "বার্মায় বৃটিশ শাসন" গ্রন্থ হতে জানা যায় একজন মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তখন বার্মায় এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে বৌদ্ধরা রেংগুনে এক বিরাট জনসভায় মিলিত হয় এবং মুসলমানদের আক্রমণ করে পত্র-পত্রিকায় উস্কানীমূলক খবর পরিবেশন করে। ফলে প্রতিটি জেলায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে এর বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের উপর চলে প্রচন্ড আক্রমণ। এতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হয় দু'শ ভারতীয় মুসলমান এবং আহত হয় প্রায় সাতশ।

১৯৪২ সালে আরো একটি মারাত্মক সংঘর্ষ সংঘটিত হয় সমাজবাদী দেশ বার্মায়। তখন বিপুলসংখ্যক মুসলমানকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ সালেও অপর একটি হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে অনেক মুসলমান ঘর-বাড়ী ছেড়ে পাকিস্তানে পলায়ন করে। কিন্তু পরে দেশে ফিরে আসলেও নিজেদের বিষয় সম্পত্তি আর ফেরত পায়নি। প্রধানমন্ত্রী উ-নো এই অন্যায় আচরণের বিচার করার কথা দিলেও নে উইনের ক্ষমতা দখলের পর এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়নি।

১৯৬২ সালে নে উইন সরকার ক্ষমতা দখলের পর বার্মায় মুসলমানদের উপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। এই সরকারের আমলে মুসলমানরা শারিরীক ভাবেই নির্যাতিত হয়নি। তাদেরকে হারাতে হয় সরকারী চাকুরী, খোয়াতে হয় নাগরিকত্ব এবং বঞ্চিত হতে হয় মৌলিক অধিকার হতেও। ১৯৬৪ সালে সরকার দেশে জাতীয়করণের নামে চালায় এক শ্বেতসন্ত্রাস এবং নিপীড়নের নতুন অভিযান। জাতীয়করণের নামে সরকার বিত্তশালী মুসলমানদের ঘরবাড়ী, দালানকোঠা, দোকানপাট এবং বিভিন্ন যানবাহন বাজেয়াপ্ত করে। আরাকান মুসলমানদের প্রতিনিধির উপর কড়াকড়ি দৃষ্টি রাখারও ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় কার্যক্রমের উপরও সৃষ্টি করা হয় বাধা-বিঘ্নের। ১৯৬২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের হজ্ব পালনের উপর জারী করা হয় নিষেধাজ্ঞা। বার্মায় কোন কোন স্থানে কুরবানী বন্ধ রাখা হয়। ধর্মীয় শিক্ষার পূর্ব অনুমতিগুলির অধিকাংশই বাতিল করে দেয়া হয়।

বার্মায় এই মুসলিম জনগোষ্ঠির উপর সে দেশের সরকারের নির্যাতন এবং নিপীড়নের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তখন মোগল আমল। সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে নির্ভীক সমরকুশলী ও ধার্মিক আওরঙ্গজেব জয়ী হন এবং দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা পালিয়ে যান আরাকানে। আরাকানের রাজা তখন সান্দু যুধমমা। আরাকান রাজা সুজার অনিন্দ সুন্দরী এক কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলে সুজা তাতে অসম্মতি জানান। ক্রুদ্ধ রাজা সুজাকে সপরিবারে হত্যা করে। এই সুযোগ গ্রহণ করে মানবরূপী সেখানকার দানবরা। তারা সেখনকার মুসলমানদের হত্যা শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত হত্যা, নির্যাতন, জেল ও জুলুমের ধারা অব্যাহত রয়েছে বার্মার আরাকানসহ বিভিন্ন অঞ্চলে।

১৮৬২ সালে আরাকান ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় জাপানীরা বার্মা দখল করে নিলে পালিয়ে যাওয়া ইংরেজরা সেখানকার মগদের হাতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তুলে দেয়। এই অস্ত্র দ্বারা মগরা শত শত মুসলমানকে

হত্যা করে এবং হাজার হাজার লোককে বিতাড়িত করে। ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতা লাভের পর বর্মী সৈন্য এবং পুলিশের সমর্থন পুষ্ট স্থানীয় মগ অধিবাসীরা রোহিংগা মুসলমানদের উপর নির্যাতন শুরু করে। মগদের এই নির্যাতন মুনলমানদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। তারা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানীদের ফেলে যাওয়া এবং গোপন পথে সংগ্রহ করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলমানরা মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে। মুহাম্মদ বিন কাসিম ছিলেন তাদের নেতা। কিন্তু শীঘ্রই রোহিঙ্গাদের জীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ। মুজাহিদ বাহিনীর একটি অংশের দুর্নীতি, কাসিমসহ বিভিন্ন নেতার চরিত্রহীনতা এবং ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের ঘটনাবলী প্রকাশ হতে থাকলে মুজাহিদ বাহিনী বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই সব উপদলের বেশ কিছু সদস্য ডাকাতি ও লুটতরাজের সাথে জড়িয়ে গড়ে। বিভক্ত মুজাহিদ বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লে জেনারেল নে উইন চরম আঘাত হানেন রোহিঙ্গাদের উপর। মুসলমানদের জীবনে নেমে আসে কালো অমানিশা যার আগুনে এখনও তারা জ্বলেপুড়েমরছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বার্মা সরকার পুনরায় মুসলমানদের উপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। যার ফলে প্রায় চল্লিশ হাজার বর্মী মুসলমান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং উদ্বাস্তুদের সরকারের হাতে তুলে দেন। কিন্তু এর পরও মুসলমানদের উপর বার্মা সরকারের নির্যাতন বন্ধ হয়নি। বার্মার সরকারী নির্যাতনের মুখে বহু মুসলমান বাংলাদেশসহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইসব উদ্বাস্তু মুসলমানদেরও দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই। বার্মার এইসব উদ্বাস্তু মুসলমানদের ব্যাপারে মুসলিম বিশ্বের কোন দেশেই কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক। এ ব্যাপারে বিশ্বের সাহায্য সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। জাতিসংঘ উদ্বাস্তুহাই কমিশন (UNHCR) দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের ছিন্নমূল মানুষের জন্য যেভাবে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে বার্মার দুঃখী মানুষের ব্যাপারে বোধ হয় ততটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। UNHCR) এর কাছে দুনিয়ার মানবতাবাদী সকল মানুষের এটা প্রত্যাশা যে তারা স্থান কাল পাত্র ভেদে নয় বরং সকল ক্ষেত্রেই সহযোগিতার উদাহরণ পেশ করবে।

এদিকে বার্মা জাতিংঘের একজন সদস্য। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘ সনদের প্রতিও পূর্ণ আস্থাশীল এবং প্রতিটি নাগরিকের জানমাল, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। কিন্তু বার্মা তার এই সুমহান অঙ্গীকারকে মোটেও তোয়াক্কা

করেনি। বরং জাতিসংঘ সনদকে পায়ে মাড়িয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর চালিয়েছে অমানবিক অত্যাচার। এই মুহূর্তে তাই জাতিসংঘ উদ্বাস্তু হাই কমিশনের উচিত রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্য যাবতীয় মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে এই সংস্থার করণীয়গুলো নিম্নরূপ হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

এক। নিঃশর্তভাবে সকল রোহিঙ্গা মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

দুই। বার্মার মুসলমানদের এক ন্যায়ানুগ এবং স্থায়ী বসবাসের উপযোগী পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধান।

তিন। রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর দৈহিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক নিপীড়ন বন্ধ করা এবং বার্মায় তাদের আইনগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া।

উপরিক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করার মত উদার মানসিকতা হয়তো বার্মার সমাজতান্ত্রিক সরকারের নাও হতে পারে। সমাজতন্ত্রে অবশ্য এ ধরনের চিন্তারও অবকাশ নেই। তবে তাই বলে গণতান্ত্রিক বিবেক, মানবতার পূজারী এবং সুস্থ চেতনা সম্পন্ন মানুষকে থেমে থাকলে চলবে না। জাতিসংঘের কার্যকারিতা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও নিপীড়িত মানুষের সমস্যার সমাধানে তাকে এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সারা বিশ্বের নিগৃহীত মানুষের দায়িত্ব পালনে এটা যেমনি সবার আশা, বার্মার ব্যাপারেও সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। ও· আই· সি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, আরব লীগ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সংগঠনগুলোর পক্ষ হতে ক্রমাগত চাপও বার্মা সরকারের চেতনার উদ্রেক করার জন্যপ্রয়োজন।

পোল্যান্ডে মুসলিম জীবন

মধ্য ইউরোপের একটি দেশ পোল্যান্ড। বাল্টিক সাগরতীরে অবস্থিত দেশটির সাংবিধানিক নাম পোলিশ গণপ্রজাতন্ত্র। পোল্যান্ড বর্তমানে সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশ হিসেবেই সমধিক পরিচিত। আয়তন ৩,১২,৫২০ বর্গ কিলোমিটার (১২,০৩৫৫ বর্গ মাইল)। ৩ কোটি ৭০ লাখ লোকের এ দেশটিতে কমিউনিষ্ট শাসনের বয়স ৪২ বছরেরও বেশী। রাজধানী ওয়ারশ। মুদ্রা জলটি (Zloty), ভাষা পোলিশ (৯০%), তুর্কী।

জাতি সত্তার দিক থেকে জনগণ পোলিশ, তাতার, তুর্কী, ককেশীয় বংশোদ্ভুত। জনগণের একাংশ নাস্তিক কমিউনিস্ট হলেও ব্যাপক খ্রীষ্টান, মুসলিম ও ইহুদী। দ্বিপক্ষীয় কিংবা ত্রিপক্ষীয় চাপ, নির্যাতন, দমন ও বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও পোল্যান্ডের প্রায় অর্ধলক্ষ মুসলমান এখনো নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার সংগ্রামে লিপ্ত। শুধু ওয়ারশতেই প্রায় দশ হাজার মুসলমানের বাস।

পোল্যান্ডের দক্ষিণে চেকশ্লোভাকিয়া, পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন, উত্তরে বাল্টিক সাগর ও পশ্চিমে গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানী। শাসনতান্ত্রিকভাবে দেশটি ৪৯টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত। প্রতি প্রদেশে রয়েছে দু'হাজার কমিউন। দেশটির জাতীয় প্রতীক হচ্ছে রক্তিম জমিনের উপর একটি শুভ্র ঈগল। পোল্যান্ডের জাতীয় রং হচ্ছে সাদা ও লাল।

পোল্যান্ড মূলতঃ একটি নিম্নভূমির দেশ। দক্ষিণে কার্পেথিয়ান পর্বতমালা এবং পশ্চিমে ওডার এ নিস নদী ব্যতীত পোল্যান্ডের কোন প্রাকৃতিক সীমানা নেই। কিসটুলী, বাগ ও ওড়ার এ দেশের ৩টি বড় নদী। পোল্যান্ডে বালিয়াড়ী, সমুদ্র সৈকত, অরন্যানী, ছোট ছোট পাহাড় পর্বত, নদনদী ও অসংখ্য লেক রয়েছে। সর্বোচ্চ পর্বত মাউন রিসে সী লেভেল থেকে ২৪৯৯ মিটার উপরে। উত্তর পূর্ব পোল্যান্ডে রয়েছে সবচেয়ে বেশী লেক।

পোল্যান্ড বিশেষতঃ এর দক্ষিণাংশ খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ। স্মরণাতীত কাল থেকে পোল্যান্ডের খনি থেকে উত্তোলিত হয়ে আসছে 'রক সল্ট' এর মত খনিজ সম্পদ। কপার, সালফার, লিগনাইট, জিংক ও ওরসহ কয়লার যে মুজুদ এ দেশে আছে তাতে সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বের সেরা খনিজ সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়েছে পোল্যান্ড। এছাড়াও আকরিক লৌহ, সীসা, চক, ক্লে, ক্যাওলিন, মার্বেল, ও গ্রানাইট এবং বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের উল্লেখযোগ্য মওজুদ রয়েছে পোল্যান্ডে।

বিশ্বযুদ্ধকালের পূর্ব পোল্যান্ডের তৈল খনিগুলো বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের দখলে।

পোল্যান্ডের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক। প্রধান কৃষি পণ্য হচ্ছে কর্ণ, যব, গম, রাই, আলু, ইক্ষু, বীট, তামাক। পোল্যান্ডের প্রধান শিল্প খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভারী শিল্প, ইস্পাত, বস্ত্র, কৃষিযন্ত্রপাতি কারখানা। প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কয়লা, কোক, যন্ত্রপাতি, পরিবহনযান, কৃষিজ পণ্য, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি।

পোল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ইসলাম

দশম শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস অজ্ঞাত। ৯৬৬ সাল থেকে পোল্যান্ডের নিয়মিত ইতিহাস পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী হচ্ছে পোল্যান্ডের স্বর্ণযুগের ইতিহাস। এ সময় পোল্যান্ড একটি শক্তিশালী দেশ ছিল। রাজা জন তৃতীয় সোভিস্কি (১৬৪২–৯৬), রাজা যোসেফ পিলসূডস্কি পোল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে খ্যাতিমান শাসক ছিলেন।

পোল্যন্ডে সর্বপ্রথম মুসলমানদের আগমন ঘটে চতুর্দশ শতাব্দীতে। তবে মুসলমানরা এখানে স্বেচ্ছায় আসেনি। এসেছিল বন্দী হিসেবে। পোলিশরা ভলগা নদীর তীরবর্তী জনবসতি থেকে মুসলমানদেরকে বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। পরবর্তী দু'শতকে আসে কয়েক লাখ তাতারী মুসলিম। এরা এসেছিল সোভিয়েত নির্যাতনে অতীষ্ট হয়ে পালিয়ে –ক্ষুধা, রোগ ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য। পোলিশ মুসলমানদের শুরুর ইতিহাস সম্পর্ক ডঃ বোগদান আতাউল্লাহ কোপানস্কি লিখেছেন, "They first began to settle here in the 14th century. Known by general term 'Tatar', they included Mongols, a variety of Turkish tribes, and even caucasians from the mountains of Daghestan." পোল্যান্ডের মুসলমানরা বর্তমানে ৬টি গ্রুপে বিভক্ত। তারা হচ্ছে ক্রুসিয়ানী, বহনিকি, হিনিকি, রিয়ালিস্টক, গদানস্কি, জেসিন এবং ওয়ারশতি। উসমানীয় তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদের শাসনামালে (১৪৫১–১৪৮১) কনস্টানটিনোপল বিজয় এবং পূর্ব ইউরোপের দেশ সমূহের উপর ক্রমান্বয়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বালটিক উপকূলে মুসলমানদের প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে উঠে। এ সময় পোল্যান্ডে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এ সময় বহু মুবাল্লিগ পোল্যান্ডে আগমন করেন। তাদের পরিকল্পিত দাওয়াতী তৎপরতায় পোল্যন্ডে মুসলমানরা একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৭৭২, ১৭৯২ এবং ১৭৯৫–৯৬ সালে প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া মিলে তিনবার পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। ফলে পরবর্তী এক শতাব্দী কাল ধরে পোল্যান্ড বলতে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু পোল্যান্ডবাসী তাদের স্বাধীনতা অর্জনে সব সময় সচেষ্ট ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে পোলিশগণ বিবদমান উভয় পক্ষেই অংশ গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর পোল্যান্ডের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং মার্শাল যোসেফ পিলসুডস্কি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পোল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। উনিশ শতকে শত শত পোলিশ ইসলাম কবুল করে। এদের মধ্যে উনিশ শতকের বিখ্যাত পোলিশ জেনারেল যোসেফ রেমন্ডও ছিলেন। দ্বীন কবুলের পর তিনি মুরাদ ফেরিক পাশা নাম গ্রহণ করেন। পরে তিনি সিরিয়ার আলেপ্পোতে ইনতিকাল করেন। পোলিশ মুসলমানরা জার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত বিখ্যাত মুজাহিদ ইমাম শামিলের জিহাদী বাহিনীতে যোগদান করে দাগিস্তানে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। পোল্যান্ডের স্বাধীকার আন্দোলনে মুসলিম অবদান আলোচনা করতে গিয়ে পোলিশ নওমুসলিম ডঃ বোগদান আতাউল্লাহ কোপানস্কি বলেন, "১৯১৮ সনে পোল্যান্ডের স্বাধীনতা অর্জনে এবং তা সংরক্ষণে মুসলমানরা পূর্ণ অংশগ্রহণ করে। ১৯২১ সালে লেনিনের বলশেভিক বাহিনী কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রান্ত হলে মুসলমানরা নিয়মিত পোলিশ বাহিনীর পাশাপাশি লড়াই করে।"

১৯১৮ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত পোল্যান্ডের স্বাধীনতার সময়ে মুসলমানরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এ সময় প্রতিবছর শত শত মুসলিম মক্কা মুয়াজ্জমায় হজ্বেও গমন করত। এ সময় পোলিশ মুসলমানদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা মুফতি জে সজিমাকিউইকজ জেরুসালেম ও কায়রোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে পোলিশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। স্বাধীন পোল্যান্ডে ৩৬টি মুসলিম ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা ছিল। সোভিয়েত সীমান্তবর্তী এজিনিয়ানী থেকে শুরু করে ওয়ারশ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ১৯৩৯ সালের আগ পর্যন্ত পোল্যান্ডে ১০০টির বেশী মসজিদ ও অসংখ্য ইসলামী স্কুল চালু ছিল। পোল্যান্ডের স্বাধীনতার এই সময়কাল ছিল মুসলমানদের জন্য সব চাইতে ভাল সময়। এ সময় তারা লালজার স্ট্যালিনের নির্যাতন থেকে হিজরত করে আসা মুসলমানদের আশ্রয়দাতার ভূমিকাও পালন করেছে। পোলিশ সেনাবাহিনীতেও এ সময় মুসলমানদের শক্তিশালী ভিত্তি ছিল। সেনা বাহিনীতে থেকে তারা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতেন। সামরিক বাহিনীতে মুসলিম সৈন্যদের আলাদা রেজিমেন্ট ও আলাদা পতাকা ছিল। তাদের পতাকা ছিল পোলিশ পতাকার সাদা ঈগলের উপর রূপালী নতুন চাঁদ। পালস্কি মুসলিমিন, দি মুসলিম

ক্রনিকল এবং দি মুসলিম রিভিউ নামে তথ্য সমৃদ্ধ ৩টি পত্রিকা এ সময় মুসলমানরা প্রকাশ করত।

পোল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ছয় হাজার। সমাজতান্ত্রিক নিষ্পেশনের মধ্যে থেকেও এসব মুসলমানরা নিজেদের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য ধরে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। সম্ভবতঃ দুনিয়ার অন্যান্য কমুনিষ্ট দেশের তুলনায় এখানকার মুসলমানরাই বর্তমানে কিছুটা নিরুপদ্রব। রাশিয়া, বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর মত অকথ্য নির্যাতনের ষ্টিমরোলার না চললেও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা হরন এবং নাস্তিকতার অনুগামী হবার যাবতীয় প্রচেষ্টা পোলান্ডে চলেছে প্রতিনিয়তই। স্বাভাবিক ধর্মকর্ম পালনের স্বাধীনতা পায়নি সেখানকার মুসলিম জনগণ। পোল্যান্ড মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করার অনুমতি দেয়া হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগের "ছাড়পত্র" দেয়নি সমাজতান্ত্রিক সরকার। "পোলিশ ইউনিয়নে" নামে মুসলমানদের একটা সংস্থা গঠন করার অনুমতি দেয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু বাইরের কোন সংগঠন বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষার যাবতীয় অধিকার থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। ফলে দেশ বিদেশের মুসলিম জনগোষ্টির সাথে সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারছে না পোলান্ডের মুসলিম জনগণ।

পোলান্ডের মুসলমানরা বর্তমানে দু'টো দিক থেকে সমস্যার মোকাবেলা করছে। একদিকে তারা জাতিগত বা রাষ্ট্রীয়ভবে ইসলাম বিদ্বেষী কমুনিষ্ট শক্তির শিকার অপরদিকে তারা ক্যাথলিক চার্চের চিরাচরিতশত্রুতা দ্বারা আক্রান্ত। রাষ্ট্র ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এটাকে 'মিথ্যা', পশ্চাদপদ ও অসভ্য' মধ্যযুগীয় বরবরতা' এবং 'নারীদের দাসত্ব' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করে থাকে। ইসলামের প্রসারতো নয়ই বরং ইসলামকে ন্যুনতম পালনের ক্ষেত্রেও পোলান্ডে রয়েছে প্রচন্ড বাধা। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সমাজতান্ত্রিক নিয়মনীতিতে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ধর্মীয় স্বাধীনতার কোন অবকাশ নেই। এছাড়াও আছে চার্চদের চরম ইসলাম বিদ্বেষ। ঐতিহাসিকভাবেই ক্যাথলিক চার্চরা সব সময় ইসলামের বিরোধীতা করে এসেছে। ক্যাথলিক পাদ্রী–পুরোহিত এবং লেখক সাহিত্যিকরা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা জিইয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন বই পুস্তক ও রচনা করেছে। উনিশ শতকের ক্যাথলিক লেখক "হেনরিক সিয়েকিউইভ" মুসলমানদের "তুর্কী দস্যু", কমিউনিষ্টদের 'ধর্ষণকারী' অত্যাচারী, 'যৌন উম্মাদ' এশিয়ার বর্বর' প্রভৃতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তার লেখায়। হেনরিক একজন কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী লেখক। তিনি তার বই 'By fire and sword'- এ লেখেন 'অতিমানবেরা' পোলান্ডের "উম্মাদ"

মুসলমানদের পরাজিত করে ইসলামের হাত হতে ইউরোপকে বাঁচিয়েছে। কতটুকু ইসলাম বিদ্বেষী হলে মুসলমানদের উম্মাদ বলে আখ্যায়িত করা যায় তারই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ এই পোলিশ ক্যাথলিক চার্চ লেখক "হেনরিক সিয়েকিউইভ"। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর হতেই মুসলমানদের উপর নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। যুদ্ধের অবসানের পর পোলান্ড চলে যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্তৃত্বে। সোভিয়েত রাশিয়া একটি কমিউনিষ্ট সরকারের অধীনে পোলান্ডে শাসন চালাতে থাকে। মানুষের সকল অধিকার এবং স্বাধীনতা পদদলিত হয় সমাজতান্ত্রিক লৌহ শাসনের কাছে। মানুষ এই লৌহ শাসন হতে মুক্তি লাভের আশায় বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬৫, ১৯৬৮, ১৯৭৬ এবং ১৯৮০ সালে পাঁচ পাঁচটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শাসনের বন্দী জীবন থেকে পোলান্ডবাসী মুক্তি লাভ করতে পারেনি। বর্তমানে মুসলমান এবং খৃষ্টান উভয়েই কমিউনিষ্টদের জুলুম নিপীড়নের শিকার। কিন্তু খৃষ্টানদের চেয়ে মুসলমানরাই বেশী নির্যাতিত। খৃষ্টানদের তুলনায় মুসলমানরাই হারিয়েছে বেশী। কমিউনিষ্ট আক্রমণের সময় যেখানে ৩৫টি মসজিদ ছিল বর্তমানে তা নেমে এসেছে ২টিতে। কমিউনিষ্টরা মুসলমানদের সবকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্তমানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা সাংগঠনিক সুযোগ সুবিধা নেই যেখানে ছেলেমেয়েদের দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে। যেসব পিতামাতা দ্বীনের সামান্য জ্ঞান রাখেন তারাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের পুঁজি। তবে অধিকাংশ পিতামাতাই দ্বীনের জ্ঞানে দুর্বল অথবা জ্ঞানশূন্য হওয়ায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। মুসলিম প্রেস এবং প্রকাশনাগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়ায় শিক্ষার আর কোন মাধ্যমও মুসলমানদের জন্য বাকী থাকেনি।

বর্তমানে কমিউনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে লেসওয়ালেসার যে তীব্র আন্দোলন চলছে তাতে পোলান্ডে সৃষ্ট হয়েছে এক তীব্র জাগরণের। এতে মুসলমানদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে ক্ষীণ জাগৃতির। নতুনভবে মুসলমানরা নিজেদের চেতনা এবং মূল্যবোধকে ফিরে পাবার জন্য এখন চেষ্টা চালাচ্ছে। সারা দুনিয়ায় যে ইসলামী পূর্ণজাগরণের সৃষ্টি হয়েছে তার দু'একটা ঢেউ পোলান্ডের মুসলমানদের হৃদয় তীরে ও এসে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়ার বর্তমান দখলীকৃত পূর্ব পোলান্ডের মুসলমানদের নিকট বর্তমান জগতের মনীষীদের লিখিত বই-পুস্তক অহরহ পৌঁছে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ হতে যেসব মুসলমান ছাত্ররা লেখাপড়া করার মানসে পোলান্ডে যাচ্ছে তাদের দু'একজনের মাধ্যমে মিশরের হাসান আল বান্না, সাইয়েদ কুতুব এবং পাকিস্তানের ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ) অনূদিত গ্রন্থাবলী

সেখানে পৌছার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন উদ্দীপনার। মুসলমানদের মধ্যেও এ চেতনার প্রমাণ মেলে কিছুদিন পূর্বের একটি পত্রিকা সংবাদের মাধ্যমে। 'ওয়ারশ'–এর সাতাশে ফেব্রুয়ারী সিনহুয়ার খবরে বলা হয় সম্প্রতি পোলান্ডে পবিত্র কোরআন শরীফের এক লাখ কপি প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তা বিক্রি হয়ে গেছে। এটা ছিল দ্বিতীয় সংস্করণ। একজন আরবী ভাষাবিদ এবং ইসলামী গবেষক ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেদসফ বিয়েলাভযাষিক গ্রন্থটির অনুবাদ করেন। ১৯২৩ সালে কায়রো থেকে প্রকাশিত সরাসরি আরবী সংস্করণ হতে গ্রন্থটির অনুবাদে সময় লাগে আট বছর। পোলিশ ভাষায় পবিত্র কোরআনের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। মূলতঃ ফরাসী ভাষা থেকে এটির অনুবাদ করেন জানমুজা তারাফ বুকজাষিক।"

পোলান্ডের এই খবরটি নিঃসন্দেহে মুসলিম মিল্লাতের জন্য সুখবর। সেখানকার অমুসলিম জনগণও কোরআন জানা বা বুঝার জন্য যে আগ্রহশীল তা বড়ই আশার কথা। পোলান্ডে মুসলিম জনতার জেগে উঠার জন্য এখন প্রয়োজন সামগ্রিক ঐক্য এবং বলিষ্ট নেতৃত্ব। মুসলিম মিল্লাতের প্রয়োজন পোলান্ডের মুসলমানদের যথা সম্ভব সার্বিক সহযোগীতা প্রদানের। সেদিন হয়তো বেশী দূরে নয় যখন পোলান্ড্রের মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সমাজতন্ত্রের মোহ থেকে উত্তরোত্তর মানুষ যেভাবে স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠছে তাতে এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয় যায় না।